তাওহীদের ডাক

জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী ২০১১

উত্তাল মধ্যপ্রাচ্য

সাক্ষাৎকার :
মুহতারাম আমীরে জামা'আত

- ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক
- সমাজে প্রচলিত শিরকসমূহ : একটি পর্যালোচনা
- আহলেহাদীছ আন্দোলন : বিদ'আতীদের উত্থান যুগে
- ফিলিস্তীন : এক অন্তহীন কান্নার প্রস্রবণ
- পৃথিবীর প্রচলিত ভাষাসমূহের একটি পরিসংখ্যান

Contents

The Call to Tawheed

তাওহীদের ডাক

৬ষ্ঠ সংখ্যা

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১১

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মুযাফফর বিন মুহসিন
নির্বাহী সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
মোবাইল : ০১৭৪৪৫৭৬৫৮৯
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www. tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ১৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও সোনালী প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৩
- **তারবিয়াত**
  আখলাকে হাসানা : গুরুত্ব ও ফযীলত ৫
  শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন
- **তাজদীদে মিল্লাত**
  মানব সমাজে শিরক প্রসারের কারণ ৯
  ইমামুদ্দীন
- **আহলেহাদীছ আন্দোলন**
  আহলেহাদীছ আন্দোলন : সংকট ও সংস্কার যুগে ১৩
  ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- **ইতিহাস-ঐতিহ্য**
  ঐতিহাসিক বালাকোটের যুদ্ধ : ঘটনাপ্রবাহ ১৫
  শিহাবুদ্দীন আহমাদ
- **চিন্তাধারা**
  অনুসরণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম ২০
  ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ
- **মনীষীদের লেখনী থেকে**
  আজকের সুশীল মুসলিম যুবসমাজের কর্তব্য ২২
  অনুবাদ : হাশেম আলী
- **সাক্ষাৎকার**
  মুহতারাম আমীরে জামা'আত ২৪
- **সাময়িক প্রসঙ্গ**
  তিউনিসিয়ার পর মিসর : কি ঘটছে মধ্যপ্রাচ্যে? ২৭
  আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রায্যাক
- **গ্রন্থ-পর্যালোচনা**
  তাওহীদের মূল সূত্রাবলী : আবূ আমিনা বিলাল ফিলিপস্ ৩২
  নূরুল ইসলাম
- **পরশ পাথর**
  একজন আউরা ফারাহ ও তার ইসলাম গ্রহণ ৩৫
  মেহেদী আরীফ
- **তারুণ্যের ভাবনা**
  মুসলিম যুবকদের প্রতি আহ্বান ৩৭
  অনুবাদ : আসিফ রেযা ও ওবায়দুল্লাহ
- **ইংরেজী প্রবন্ধ**
  Eve-teasing and a search for the solution ৪১
  Zahidul Islam
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৪৪
- **ভিনদেশের চিঠি** ৪৮
- **কবিতা** ৫১
- **পথে-প্রান্তরে** ৫২
- **সংগঠন সংবাদ** ৫৩
- **সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব** ৫৪
- **সাম্প্রতিক বাংলাদেশ** ৫৫
- **সাম্প্রতিক বিশ্ব** ৫৫
- **আইকিউ** ৫৬

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম

মধ্যপ্রাচ্যে ঐতিহাসিক গণজাগরণ : তারুণ্যের বিজয়

জনতার দুর্বার গণবিক্ষোভের মুখে গত ১৪ জানুয়ারী তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট যায়নুল আবেদীন বিন আলীর ২৩ বছরের দীর্ঘ শাসনামলের অবসান ঘটে। গণরোষ প্রশমনের লক্ষ্যে তিনি মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে যরূরী অবস্থা জারী করেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। অবশেষে ঐ একই দিনে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি সঊদী আরবে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিউনিসিয়ার গণবিপ্লবের ঢেউ লাগে পার্শ্ববর্তী মিসর, জর্ডান, ইয়েমেন, আলজেরিয়া, সুদান, আলবেনিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশে। একই সঙ্গে এতগুলো রাষ্ট্রে গণজাগরণের ঘটনা অভূতপূর্ব। জর্ডানেও গণবিস্ফোরণ এড়াতে বাদশাহ আব্দুল্লাহ মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়েছেন। ঐ একই উদ্দেশ্যে ইয়েমেনের দীর্ঘ ৩২ বছরের শাসক আলী আব্দুল্লাহ ছালেহ ২০১৩ সালের পর ক্ষমতায় থাকবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

এদিকে মাত্র ১৮ দিনের গণজাগরণের তোপে দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা হোসনী মোবারক (৮২) অবশেষে গত ১১ ফেব্রুয়ারী ক্ষমতার মসনদ থেকে ছিটকে পড়েছেন। গত ২৫ জানুয়ারী শুরু হওয়া গণঅভ্যুত্থানের মাত্র ১৮ দিনের মাথায় ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে নির্যাতন ও ঘৃণার প্রতীক হয়ে ওঠা মোবারকের ক্ষমতায় টিকে থাকার লালিত স্বপ্ন-সাধ। ১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী ইরানে এক গণবিপ্লবের মাধ্যমে পতন ঘটেছিল স্বৈরশাসক রেযা শাহ পাহলভীর। তার ঠিক ৩২ বছর পরে একই দিনে গণবিক্ষোভের ঝাপটায় ধসে গেল আরেক স্বৈরাচারের তখতে তাউস। ক্ষমতায় টিকে থাকার নিরন্তর কোশেশ করেও জনরোষের কবলে পড়ে তিনি নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। মিসরের রাজধানী কায়রোর তাহরীর স্কয়ারের ঘটনা ২১ বছর আগে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ের বিখ্যাত তিয়েন আনমেন স্কয়ারে সংঘটিত ঘটনাবলীর কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৫২ সালে জামাল আব্দুন নাছেরের নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মিসরে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছিল। এরপর যে চারজন প্রেসিডেন্ট মিসর শাসন করেছেন, তারা সবাই এসেছিলেন সেনাবাহিনী থেকেই। ১৯৮১ সালের ৬ অক্টোবর আততায়ীর গুলিতে নিহত হন মিসরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত। এর এক সপ্তাহ পর তার স্থলাভিষিক্ত হন তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক। পরবর্তী মাসে গণভোটে মোবারক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এরপর থেকে গত ৩০ বছর তিনি ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে ধরেছিলেন। গণধিকৃত এই স্বৈরশাসক দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও দুর্নীতির বিষবাষ্পে বিষিয়ে তুলেছিলেন মিসরের জনজীবন। বঞ্চনা, নির্যাতন ও হতাশায় গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন মানুষের মূল্যবোধ, আত্মসম্মান ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে। তিন দশকে স্বৈরাচারীর বুলডোজার পিষ্ট করেছে হাযার হাযার রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে। কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন অগণিত অধিকার সচেতন শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, আইনজীবি ও মানবাধিকার কর্মী। ইসরাঈল ও আমেরিকার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও ফিলিস্তীনের জনগণের উপর নির্বিচারে আক্রমণ পরিচালনার পরও ইসরাঈলের তল্পীবাহক হিসাবে কাজ করে যাওয়ায় মিসরের জনগণ ছিল তার উপর দারুণ ক্ষুব্ধ। এসবের প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠা টানা ১৮ দিনের গণবিক্ষোভে মোবারক বাহিনীর হামলায় তিন শতাধিক সাধারণ মানুষ নিহত ও চার সহস্রাধিক আহত হয়েছে। ৩০ বছর যাবৎ শাসরুদ্ধকর যরূরী আইনের নিগড় থেকে মুক্তির আনন্দে গত ১১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রাজধানী কায়রো সহ সর্বত্র দেখা যায় জনতার বাঁধভাঙ্গা উল্লাস।

শাসন-শোষণ, যুলুম-নির্যাতন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ যুগে যুগে এভাবেই বিস্তৃত হয়েছে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে। মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এ সত্য নতুন করে আবার বিশ্ববাসীর সামনে প্রতিষ্ঠিত হল। এসব আন্দোলনের পুরোধা ছিল তরুণ সমাজ। এর দ্বারা আবারো প্রমাণিত হল যে, যে কোন অপশক্তির বিরুদ্ধে তরুণরা জেগে উঠলে তার পরাজয় সুনিশ্চিত এবং তারা তাদের দাবী যে কোন মূল্যে আদায় করেই ছাড়ে। এভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তরুণ সমাজ জেগে উঠলে দ্বীনের পতাকা উড্ডীন হবে দিকে দিকে– এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ আমাদের তরুণ সমাজকে চেতনাদীপ্ত হয়ে ইসলামের খেদমতে সর্বস্ব কুরবানী দেওয়ার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

ছবর বা ধৈর্য

আল-কুরআনুল কারীম :

১– يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ –

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাত আদায়ের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন’ *(বাক্বারাহ ১৫৩)*।

২– أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ–

‘তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল?’ *(আলে ইমরান ১৪২)*।

৩– يا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ–

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর এবং সহিষ্ণু ও সুপ্রতিষ্ঠিত হও এবং আল্লাহকে ভয় কর– যেন তোমরা সুফলপ্রাপ্ত হও’ *(আলে ইমরান ২০০)*।

৪– وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ–

‘তুমি তোমার প্রতি প্রেরিত ওহীর অনুসরণ কর, আর ধৈর্যধারণ কর এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ মীমাংসা করে দেন এবং তিনিই উত্তম মীমাংসাকারী’ *(ইউনুস ১০৯)*।

৫– وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ–

‘এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি বা ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে এবং ঐসব ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করুন’ *(বাক্বারাহ ১৫৫)*।

৬– وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا–

‘নিজেকে তুমি আবদ্ধ রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না; যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে, তুমি তার আনুগত্য করো না’ *(কাহ্ফ ২৮)*।

৭– وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ–

‘(হে বৎস!) ...বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ’ *(লোকমান ১৭)*।

৮– وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ –

‘শপথ যুগের। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং ধৈর্যধারণে উদ্বুদ্ধ করে’ *(আছর ১-৪)*।

৯– وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ–

‘যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি প্রতিশোধ গ্রহণ করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তা উত্তম’ *(নাহল ১২৬)*।

১০– وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُوْنَ–

‘আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহ্র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেউ পাবে না’ *(ক্বাছাছ ৮০)*।

১১–وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ – وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيْمٍ–

‘ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা। তখন দেখবে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে, সে হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী হয় শুধু তারাই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী হয় শুধু তারাই যারা মহা ভাগ্যবান’ *(হামীম সাজদাহ ৩৪-৩৫)*।

হাদীছে নববী থেকে :

১২– عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– : مَا يَكُنْ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ لاَ أَدَّخِرْهُ عَنْكُمْ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفُّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِه اللَّهُ ، وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ " متفق عليه–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আমার কাছে যা কিছু কল্যাণ রয়েছে তা আমি তোমাদের বঞ্চিত করে আগলিয়ে রাখব না। যে ব্যক্তি পাপমুক্ত হতে চায় আল্লাহ তাকে পাপমুক্ত করেন। যে ব্যক্তি মানুষের পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বাঁচতে চায় আল্লাহ তাকে মুখাপেক্ষিহীন করে দেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল করে দেন। কোন ব্যক্তিকে যা কিছু দান করা হয় তার মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্ববৃহৎ হল ধৈর্য’ *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৪৪)*।

১৩– عَنْ مَحْمُود بْنِ لَبِيد أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ" صحيح الجامع–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ যখন কোন কওমকে ভালবাসেন তখন তাদেরকে পরীক্ষা করেন। যে ধৈর্য ধারণ করে তার জন্য ধৈর্যের উপায় বের করে দেয়া হয় এবং যে অধৈর্য হয়ে যায় তাকে ধৈর্যহীনতায় নিক্ষেপ করা হয় ’ *(ছহীহুল জামে‘ হা/১৭০৬)*।

১৪– عَنْ أَبِى مَالِك الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– "..وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ " رواه مسلم–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ছাদাকা হল দলীল, ধৈর্য হল আলো আর কুরআন হল তোমার পক্ষে বা তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ’ *(ছহীহুল জামে‘ হা/২৪০৩)*।

١٥- عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– "عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ" رواه مسلم–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের ব্যাপারটাই অদ্ভুত। তার সব কাজই তার জন্য মঙ্গলময়। একজন মুমিন ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে এমনটি হয় না। যখনই তার সামনে প্রফুল্ল সময় উপস্থিত হয় সে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর যদি দুর্ভোগ উপস্থিত হয় সে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৭)*।

١٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنه– "وَاعْلَمْ أَنَّ فِى الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيراً وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" رواه أحمد–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জেনে রেখ! তোমার নিকট অপছন্দনীয় কোন ব্যাপারে যদি তুমি ধৈর্য ধারণ কর তবে তাতে তোমার জন্য রয়েছে অনেক কল্যাণ। আর নিশ্চয়ই বিজয় আসে ধৈর্যের সাথে এবং বিপদের সাথে রয়েছে বিপদমুক্তির পথ। আর কাঠিন্যের পর সহজ আসে' *(আহমাদ হা/২৮০৪)*।

١٧- عَنْ أَنَسٍ – رضي الله عنه– قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم : "الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى" . متفق عليه–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছবর হল সেটাই যেটা প্রথম ধাক্কাতে সহ্য করতে হয়' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৭২৮)*।

١٨- عن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ "الْمُؤْمِنُ الَّذِى يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِىْ لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ " صحيح الجامع–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে মুমিন মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে সে ব্যক্তি অধিক ছওয়াবের অধিকারী ঐ ব্যক্তির চেয়ে যে মানুষের সাথে মেশে না এবং তাদের দেয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে না' *(ছহীহুল জামে' হা/৬৬৫১)*।

١٩- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ "مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ" متفق عليه–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুসলমানকে যদি ক্লান্তি, কষ্ট, দুঃখ, বেদনা, দুর্যোগ বা নিরাশা এমনকি যদি একটি কাটাও বিঁধে তবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩৭)*।

٢٠- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– "مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَة فِى نَفْسِه وَوَلَدِه وَمَالِه حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ" رواه الترمذي-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুমিন এবং মুমিনাদের জীবন, সন্তান ও মাল-সম্পদের উপর বালা-মুছিবত অব্যাহত থাকে, এমনকি সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করে এমতাবস্থায় তার আর কোন পাপ থাকে না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৫৬৭, সনদ হাসান)*।

বিদ্বানদের কথা :

১. ওমর (রাঃ) বলেন, আমাদের সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল হল ছবর বা ধৈর্য' *(তা'লীক্বাতুল বুখারী হা/৬৪৭০)*।

২. আলী (রাঃ) বলেন, ছবর এমন একটি বাহন যা কখনো পথ ভুল করে না *(উদ্দাতুছ ছাবেরীন, পৃঃ ১৭)*।

৩. আলী (রাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ছবর ঈমানের এমন একটি অংশ যেমন মাথা শরীরের অংশ অর্থাৎ মাথাবিহীন শরীর যেমন অকার্যকর তেমনি ছবরবিহীন ঈমানও অকার্যকর। অতঃপর উচ্চকণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, সাবধান! ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই যার ধৈর্য নেই *(বাছায়েরু যাবিত তামযীয, ৩/৩৭৬ পৃঃ)*।

৪. সুফিয়ান ছাওরী বলেন, ছবর তিন প্রকার– (১) নিজের ব্যথা বেদনাকে কারো সামনে প্রকাশ না করা। (২) নিজের সমস্যা কাউকে না বলা। (৩) নিজের প্রশংসা না করা *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/৪৮৯ পৃঃ)*।

৫. ইবনুল কাইয়িম বলেন, ছবর তিন প্রকার– আল্লাহ্র নির্দেশিত আমলসমূহের উপর ধৈর্য রাখা যতক্ষণ না তা আদায় করা হয়। নিষিদ্ধ কাজ থেকে ছবর করা যাতে তার মাঝে পতিত না হয় এবং তাক্বদীর তথা ভাগ্যের উপর দোষারোপ না করে তার প্রতি নির্ভরতা রাখা *(মাদারিজুস সালেকীন ১/১৬৫)*।

৬. ইবনুল কাইয়িম বলেন, ইমাম শাফেঈকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন ব্যক্তি উত্তম– যে সামর্থ্যবান হয়েছে যে, না কি যে বিপদের শিকার হয়েছে? তিনি বললেন, বালা-মুছীবতের শিকার না হলে সামর্থ্যবান হওয়া যায় না। আল্লাহ তাআলা নূহ, ইবরাহীম, মুহাম্মাদ (ছাঃ) সকলকেই বিপদের মুখোমুখি করেছিলেন। অতঃপর যখন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলেন তখন তাদেরকে সামর্থ্যবান করা হয়। মূলত বিপদ-দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির কথা কেউ ভাবতেও পারে না *(আল ফাওয়ায়েদ, পৃঃ ২৮৩)*।

৭. হারীরী বলেন, ছবর হল আনন্দ-বিষাদ নির্বিশেষে সকল সময়ে নিজ আত্মাকে সুস্থির রাখা *(বাছায়েরু যাবিত তামযীয, ৩/৩৭৭ পৃঃ)*।

৮. যুন্নুন মিছরী বলেন, তর্কবাজি, মতবিভক্তি থেকে দূরে থাকা, দুঃখ-কষ্টের মুখে শান্ত থাকা, জীবিকার ময়দানে দীর্ঘকাল দারিদ্র্যের সাথে লড়েও নিজেকে মুখাপেক্ষীহীনভাবে প্রকাশ করা *(ঐ)*।

সারবস্তু

১. ছবর মানুষের সবচেয়ে বড় আত্মিক শক্তি।

২. ছবর এমন এক আভ্যন্তরীণ শক্তিশালী অস্ত্র যার মাধ্যমে মানুষ বড় বড় বিপদ ও বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করতে পারে।

৩. ছবর মানুষকে বিপদে-আপদে রক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

৪. সঠিক সময়ে সঠিক দায়িত্ব পালন ধৈর্যশীল ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব।

৫. চঞ্চলতা ও তাড়াহুড়ার পরিবর্তে স্থৈর্য ও স্থিতিশীলতা দান করে ছবর।

৬. ক্রোধের মত দুর্দমনীয়, অপ্রতিরোধ্য বদগুণকে প্রতিরোধ করে ধৈর্য।

৭. ভীতির সময় ভীতি থাকা সত্ত্বেও নিজেকে সাহসীভাবে উপস্থাপনের ক্ষমতা দান করে ছবর।

৮. ছবরের মাধ্যমেই কুপ্রবৃত্তির অস্থির নেশাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়।

৯. ছবর একজন প্রকৃত মুসলিমের জন্য অপরিহার্য গুণ, যা তার ঈমানের প্রমাণ বহন করে।

১০. ছবর অন্তরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করে।

১১. ছবরের ফলে আল্লাহ ও মানুষের প্রতি মুহাব্বাত সৃষ্টি হয়।

১২. পৃথিবীর বুকে ক্ষমতাবান হওয়ার মাধ্যম হল ছবর।

১৩. ছবরের মাধ্যমে ব্যক্তির প্রকৃত ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে।

১৪. পরকালীন জীবনে সাফল্য অর্জন ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ হল ধৈর্য।

১৫. আল্লাহ সবসময় ছবরকারীদের সাথে থাকেন।

১৬. আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হয় ধৈর্যশীলদের উপর।

আখলাকে হাসানা : গুরুত্ব ও ফযীলত

-শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন

ভূমিকা :

আল্লাহ বলেন, يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُوْنَ، إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ– ‘সেদিন সন্তানাদি ও মাল-সম্পদ কোন উপকারে আসবে না। উপকৃত হবে কেবল সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র নিকট আসবে ‘ক্বালবে সালীম’ বা নিরাপদ অন্তর নিয়ে’ *(শু‘আরা ৮৮, ৮৯)*। বস্তুত ক্বালবে সালীমের বহিঃপ্রকাশই আখলাকে হাসানা বা উত্তম চরিত্র। আখলাকে হাসানা মানব চরিত্রের প্রতিটি বাঁকে ঈমানময় আভা বিকিরণ করে। ফলে মানব চরিত্র হয়ে ওঠে শরী‘আত নির্ভর ও সৌন্দর্যের প্রতিভূ।

খবরের কাগজ খুললে দেখা যায় কাগজের শুষ্ক দেহখানির অধিকাংশই পঙ্কিল খবরে ঢাকা। অতসব অসার, অনাকাঙ্খিত খবরে ঢেকে থাকতে থাকতে সে যেন আজ বড় বিপদগ্রস্থ। বর্তমান সামাজিক অবস্থা কোন অংশে জাহেলিয়াতের যুগের চেয়ে কম নয়। এগুলো থেকে মুক্তির উপায় কি? আরব জাহেলী সমাজ যখন নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, চরিত্রহীনতার অতলে হারিয়ে যাচ্ছিল, এমনিতর সময়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এলেন আখলাকে হাসানা পরিপূর্ণতার জন্য। তিনি আখলাকে হাসানার যে বাস্তব দৃষ্টান্ত দাঁড় করিয়ে দেখিয়েছেন তার সংস্পর্শ থেকে মানব জাতি অনেক দূরে। উত্তম চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টিকে ভাল করে রপ্ত করতে না পারলে আমাদের মুক্তি ও শান্তির আশা একেবারেই ক্ষীণ। উন্নত জাতি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদেরকে আবারও সমবেত হতে হবে আখলাকে হাসানার নিবিড় ছায়াতলে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা আখলাকে হাসানার পরিচয়, গুরুত্ব-ফযীলত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আখলাকে হাসানার পরিচয় :

أخلاق শব্দটি বহুবচন। একবচনে خُلْقٌ বা خُلُــقٌ। শাব্দিক অর্থ স্বভাব, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, অভ্যাস, বৈশিষ্ট্য, শিষ্টাচার প্রভৃতি। লুইস মা‘লূফ বলেন, اَلْخُلُقُ ج اخلاق : اَلْمُرُوْءَةُ، اَلْعَادَةُ، اَلسَّجِيَّةُ، اَلطَّبْعُ ‘খুলুক শব্দটির বহুবচন اخــلاق। আভিধানিক অর্থ ব্যক্তিত্ব, অভ্যাস, স্বভাব, জন্মগত স্বভাব প্রভৃতি’ *(আল মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আ‘লাম, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল মাশরিক, ১৯৭৩ইং), পৃঃ ৯৪)*।

حــسنة শব্দের অর্থ সুন্দর, উৎকৃষ্ট, ভাল প্রভৃতি। সুতরাং আল-আখলাকুল হাসানা অর্থ : সুন্দর স্বভাব, উৎকৃষ্ট ব্যক্তিত্ব, ভাল অভ্যাস, উত্তম চরিত্র প্রভৃতি। পরিভাষায়, কথায়-কাজে নিরহংকার ও উত্তম আচরণ ফুটে ওঠার নাম আখলাকে হাসানা।

আল্লামা জুরজানী আখলাকে হাসানার একটি যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তৎপ্রণীত ‘কিতাবুত তা‘রীফাত’ নামক গ্রন্থে। তিনি বলেন,

اَلْخُلُقُ عِبَارَةٌ عَنْ هَيْئَةٍ لِلنَّفْسِ رَاسِخَةٌ تَصْدُرُ عَنْهَا الْاَفْعَالُ بِسُهُوْلَةٍ وَيُسْرٍ مِــنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اِلَى فِكْرٍ وَرَوِيَّةٍ فَاِنْ كَانَتِ الْهَيْئَةُ بِحَيْثُ تَــصْدُرُ عَنْهَــا الْاَفْعَــالُ الْجَمِيْلَةُ عَقْلاً وَشَرْعًا بِسُهُوْلَةٍ، سُمِّيَتِ الْهَيْئَةُ خُلُقًا حَسَنًا–

‘খুলুক বা চরিত্র হচ্ছে আত্মার বদ্ধমূল এমন একটি অবস্থা, যা থেকে কোন চিন্তা-ভাবনা ব্যতীতই অনায়াসে যাবতীয় কার্যকলাপ প্রকাশ পায়। আত্মার ঐ অবস্থা থেকে যদি বিবেক-বুদ্ধি ও শরীআতের আলোকে প্রশংসনীয় কার্যকলাপ প্রকাশ হয় তবে তাকে আখলাকে হাসানা নামে অভিহিত করা হয় *(শরীফ আলী বিন মুহাম্মাদ আল-জুরজানী, কিতাবুত তা‘রীফাত, পৃঃ ১০১)*। অর্থাৎ কোন মানুষের নিকট থেকে যদি স্বভাবগতভাবে প্রশংসনীয় আচার-আচরণ প্রকাশ পায় তবে তাকে আখলাকে হাসানা বলা হয়।

Oxford dictionary তে বলা হয়েছে- Character is the particular combination of qualities in a person that makes him different from other. It is such a quality which leads a man to be determined and able to bear dificulties. ‘চরিত্র হচ্ছে কোন মানুষের মধ্যে এমন কতগুলো স্বতন্ত্র গুণাবলীর সমাবেশ, যা মানুষকে অন্যদের থেকে পৃথক করে। এগুলো এমন কিছু গুণ, যা মানুষকে সংকল্পবদ্ধ হতে ও কঠিন কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে।

হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, حُسْنُ الْخُلُقِ بَسْطُ الْوَجْهِ وَبَذْلُ النَّدَى وَكَفُّ الْاَذَى ‘সচ্চরিত্র হল হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, দানশীলতা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া’ *(আবূ বকর আল জাযাইরী, মিনহাজুল মুসলিম, পৃঃ ১১৫)*।

আখলাকের প্রকারভেদ :

আখলাক বা চরিত্র দুই প্রকার। যেমন (১) আখলাকে হাসানা বা সচ্চরিত্র (২) আখলাকে সায়্যিয়াহ বা মন্দ চরিত্র *(সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ইং), পৃঃ ৭১৫)*। শরী‘আত যে সমস্ত স্বভাব-কর্মের জন্য মানুষকে প্রশংসিত ও উৎসাহিত করে তাকে আখলাকে হাসানা বলে। আর যে সমস্ত স্বভাব-কর্মের জন্য নিন্দিত ও তিরস্কৃত করেছে তাকে আখলাকে সায়্যিয়াহ বলে। আল্লামা জুরজানী বলেন, অন্তর থেকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও শরী‘আতের আলোকে যে সমস্ত প্রশংসনীয় আচরণ প্রকাশ পায় তার নাম সচ্চচিত্র। আর যদি স্বভাবগতভাবে মন্দকর্ম সমূহ প্রকাশ পায় তার নাম মন্দ চরিত্র *(আল-আখলাকুল ফাযেলা, পৃ: ৩১)*।

উল্লেখ্য, মানুষের দু’এক দিনের আচরণ তার স্বভাব বা চরিত্র হতে পারে না। বরং সচ্চরিত্র বা মন্দ চরিত্র তখনই বলা হবে যখন এগুলো স্বভাবগতভাবে প্রকাশ পাবে। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ বিন সাইফুল্লাহ বলেন, আমরা বলি, এটি (সচ্চরিত্র বা মন্দ চরিত্র) একটি বদ্ধমূল বা স্থায়ী অবস্থা। যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে সম্পদ ব্যয় করে তাকে দানশীল বলা যাবে না। কারণ এটি তার নিজস্ব স্বভাবে নেই। অনুরূপভাবে কেউ রাগের সময় কষ্ট করে চুপ করে থাকার ভান করলে তাকেও ধৈর্যশীল বলা যাবে না *(আল-আখলাকুল ফাযেলা, পৃঃ ৩১)*। মোট কথা, স্বভাবগত উত্তম ও প্রশংসনীয় কর্ম সমষ্টির নাম আখলাকে হাসানা। আর স্বভাবগত মন্দ কর্ম সমষ্টির নাম আখলাকে সায়্যিয়াহ।

আখলাকে হাসানার গুরুত্ব ও ফযীলত :

আখলাকে হাসানার প্রতি শরী'আত যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। ইনজেকশনের মাধ্যমে ঔষধ প্রয়োগ করলে যেমন তা সহজেই শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে যায়, তেমন আখলাকে হাসানা নামের সজীব বৃক্ষটির মযবুত পরশে মানব জীবনের প্রতিটি পরত হয়ে ওঠে ক্লেশমুক্ত, নির্ঝঞ্ঝট ও পরিচ্ছন্ন। তাই উভয় জাহানে সফলতা লাভের মানদণ্ড নিরূপণ করা হয়েছে আখলাকে হাসানাকে। সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিকে প্রর্বোত্তম মানুষ হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যার চরিত্র সবচেয়ে ভাল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৫৪, ৯/১৬৮, 'কোমলতা, লাজুকতা ও সচ্চরিত্রতা' অনুচ্ছেদ)*।

তিনি বলেন, مَا شَيْءٌ أَثْقَلَ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে জিনিসটি রাখা হবে তা হচ্ছে উত্তম চরিত্র' *(তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/২০০২, সনদ ছহীহ; তাহক্বীক্ব আবূদাঊদ হা/৪৭৯৯, 'সচ্চরিত্র' অধ্যায়)*। আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَا مِنْ شَيْءٍ يُوْضَعُ فِى الْمِيْزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، شَأْنَ صَاحِبِ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ. 'মুমিনের মিযানের পাল্লায় সচ্চরিত্র অপেক্ষা ভারী কোন কিছুই রাখা হবে না। সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি সর্বদা (দিনে) ছিয়াম পালনকারী ও (রাতে) ছালাত আদায়কারীর ন্যায়' *(তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/২০০৩, সনদ ছহীহ; তাহক্বীক্ব আবূ দাঊদ হা/৪৭৯৮)*। দিনভর ছিয়াম রেখে, রাতভর ছালাত আদায় করে কোন ব্যক্তি যে নেকী পাবেন, সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি তার সচ্চরিত্রের কারণে সে পরিমাণ নেকীর ভাগীদার হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে তার চরিত্রকে সুন্দর করেছে, আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে প্রাসাদ নির্মাণের জন্য যামিন হব' *(তাহক্বীক্ব আবূদাঊদ, হা/৪৮০০, সনদ ছহীহ)*।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا– 'ঈমানের দিক দিয়ে সর্বাধিক কামিল সে ব্যক্তি, যার চরিত্র সর্বোত্তম। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা, যারা স্ত্রীদের সাথে সর্বোত্তম আচরণকারী' *(তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/১১৬২; সনদ হাসান ছহীহ; তাহক্বীক্ব আবূ দাঊদ হা/৪৬৮২)*। কামিল মুমিন হওয়ার জন্য অত্র হাদীছে চরিত্রের কামালিয়াত শর্তারোপ করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন জিনিস মানুষকে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বলেন, আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র। আবারও জিজ্ঞাসা করা হল, কোন জিনিস বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে? তিনি বলেন, মুখ ও লজ্জাস্থান' *(তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/২০০৪, সনদ হাসান)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সৎ কাজ হল উত্তম স্বভাব। আর পাপ কাজ হল, যে কাজ তোমার অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি করে। তুমি ঐ কাজটি জনসমাজে প্রকাশ পাওয়াটা অপছন্দ কর *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৫২, ৯/১৬৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَىَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا 'তোমাদের মধ্যে যার স্বভাব-চরিত্র সর্বোত্তম সে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আর ক্বিয়ামত দিবসেও সে আমার কাছাকাছি অবস্থান করবে *(তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/২০১৮, সনদ ছহীহ)*। এমন আশাব্যঞ্জক হাদীছ গভীরভাবে পড়লে নিশ্চয়ই তাক্বওয়াশীল হৃদয় উত্তম চরিত্র অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবে। মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন জিনিসটি সর্বোত্তম যা মানব জাতিকে দেয়া হয়েছে? তিনি বলেন, সচ্চরিত্র *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫০৭৮, সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৫৭, ৯/১৬৯)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ حُسْنَ الاَخْلاَقِ 'আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫০৯৭, সনদ হাসান, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৭০, ৯/১৭২)*। রাসূল (ছাঃ) ছিলেন সচ্চরিত্রের মূর্তিমান আদর্শ। তাঁর চরিত্রের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী' *(ক্বলাম ৪)*। তিনিও তার চরিত্রকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য বলতেন, اللهم حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَأَحْسِنْ خُلُقِىْ 'হে আল্লাহ তুমি আমার গঠন সুন্দর করেছ, সুতরাং আমার চরিত্রকে সুন্দর কর *(আহমাদ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫০৯৯, সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৭২, ৯/১৭৩)*। সুতরাং সচ্চরিত্র মানব জীবনের জন্য কতটা প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ, তা এই হাদীছ থেকে সহজেই অনুমেয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব না, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? তাঁরা বললেন, অবশ্যই। তিনি (ছাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম, যিনি বয়সে বড় এবং স্বভাব-চরিত্রে ভাল *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫১০০, সনদ ছহীহ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব না, যার উপর জাহান্নাম হারাম আর জাহান্নাম যার জন্য হারাম? তারা হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার মেজায নরম, কোমল স্বভাব, মানুষের সাথে মিশুক এবং সহজ-সরল *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৪, সনদ ছহীহ)*। উল্লিখিত হাদীছগুলো থেকে আমরা সচ্চরিত্রের ফযীলত জানতে পেরেছি। সচ্চরিত্রের কারণে একজন মানুষকে সর্বোত্তম ঘোষণা করা হয়েছে। বিভীষিকাময় ক্বিয়ামত কালে আল্লাহ যখন চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ চুকাতে মানব আমল মিযানের পাল্লায় তুলবেন, তখন সচ্চরিত্র সৌভাগ্যের স্বপ্নকাঠি হয়ে সবচেয়ে বেশি ভারী হবে। ব্যক্তির উত্তম-ভাল স্বভাবগুলো তার দুর্দিনে কতটা ফলদায়ক হবে, তা সে কল্পনাও করতে পারবে না। সচ্চরিত্রের জন্য সে 'ছাহেবুছ ছাওম' অর্থাৎ সারা বছর ছিয়াম পালনকারী ও 'ছাহেবুছ ছালাত' অর্থাৎ সারারাত ছালাত আদায়কারীর ন্যায় ছওয়াব পাবে। হাদীছে সচ্চরিত্রের জন্য এত এত নেকী ও মর্যাদা ঘোষণা করাতে সচ্চরিত্রের গুরুত্ব ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ফুটে ওঠেছে। বস্তুত সচ্চরিত্র সামাজিক শৃংখলার হাতিয়ার। এটি ব্যতীত সুখ-শান্তির কল্পনা অবান্তর। সচ্চরিত্র অর্জনে আমাদের অনুপ্রাণিত হওয়া, প্রচেষ্টা চালানো একান্ত কর্তব্য।

আখলাকে সায়্যিয়াহ বা মন্দ চরিত্রের পরিণতি :

শরী'আত বিভিন্ন ফযীলতের ঘোষণা দিয়ে যেমন আখলাকে হাসানা অর্জনে উৎসাহিত করেছে ও তাকীদ দিয়েছে, তেমনি বিভিন্ন মন্দ

Contents

পরিণতি ও শাস্তির হুঁশিয়ার করে অপছন্দনীয় ও নিন্দিত স্বভাব বর্জনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ব্যক্তির মন্দ স্বভাব তার জান্নাত হারানোর অন্যতম কারণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لا يَــدْخُلُ الْجَنَّـــةَ الْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِىُّ 'দুশ্চরিত্র ও রূঢ় স্বভাবের মানুষ জান্নাতে যাবে না' *(তাহক্বীক্ব আবু দাঊদ হা/৪৮০১, সনদ ছহীহ)*। মন্দ স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য তো এই একটি হাদীছই যথেষ্ট যে, তার লালিত মন্দ স্বভাব জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম বাধা হবে।

অন্য একটি হাদীছে এসেছে-

عن ابى هريرة رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وصلم قال اَتَدْرُوْنَ مَا لْمُفْلسُ قَالُوْا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَّلَوةٍ وَّصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَّيَأْتِىْ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَ سَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاته وَهَذَا مِنْ حَسَنَاته فَانْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يَقْضَى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِمْ ... طُرِحَ فِى النَّار–

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কি জান অভাবী কে? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে তো সেই অভাবী যার টাকা-কড়ি ও অর্থ-সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে সেই সবচেয়ে বেশি অভাবী হবে, যে দুনিয়াতে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত আদায় করে আসবে এবং সাথে সাথে সেই লোকেরাও আসবে, কাউকে সে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল-সম্পদ আত্মসাত করেছে, কাউকে হত্যা করেছে, কাউকে আবার মেরেছে। সুতরাং এই হক্বদারকে (ছালাত-ছিয়াম নিয়ে আগমনকারী) তার নেকী দেয়া হবে। আবার ঐ হকদারকেও (পূর্বোক্ত হক্বদার যার উপর যুলুম করেছিল) তার নেকী দেয়া হবে। এভাবে পরিশোধ করতে গিয়ে যদি তার (প্রথমতো ব্যক্তির) নেকী শেষ হয়ে যায় তবে তাদের (পরের হক্বদারের) গুণাহসমূহ ঐ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে (প্রথম হক্বদারকে) জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯০০, ৯/১৮৪)*।

ব্যক্তির মন্দ চরিত্র কিভাবে তাকে নাজেহাল করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে অত্র হাদীছটি তার বাস্তব চিত্র। সে আমলকারী কতই না হতভাগা, যে আমল করেছে কিন্তু মজ্জাগত বদ অভ্যাসগুলো ছাড়তে পারেনি। ফলে এই অভ্যাসগুলো তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছেড়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَيَدْخُلُ الْجَنَّـــةَ قَتَّـــاتٌ 'চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(মুত্তাফাক্ব, মিশকাত হা/৪৬১২, ৯/৮০, 'জিহ্বার সংযম, গীবত ও গাল-মন্দ অনুচ্ছেদ)*। যেসব ব্যক্তি নিজের স্বার্থের জন্য সত্য ও ন্যায়কে পাশ কাটিয়ে পরিস্তিতির অনুকূলে কথা বলে তাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– ذَا الْوَجْهَيْنِ الذِّىْ يَأْتِىْ هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَـــؤُلاَءِ بِوَجْـــهٍ 'ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিকে তোমরা সর্বাধিক মন্দ অবস্থায় পাবে, যে দ্বিমুখী। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে আসে, আরেক মুখ নিয়ে ওদের কাছে যায় *(মুত্তাফাক্ব, মিশকাত হা/৪৬১১, ৯/৮০)*।

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنَّانٌ ولاعَاقٌ ولامُدْمِنُ خَمْـــرٍ 'উপকার করে খোঁটা দানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ও সর্বদা মদ পানকারী জান্নাতে যাবে না' *(মিশকাত হা/৪৭১৬, ৯/১১৯, 'সৎ কাজ ও সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ; তাহক্বীক্ব নাসাঈ হা/৫৬৭২, সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, المؤمِنُ غِرٌّكَرِيْمٌ وَالفَاجِرُ خِبٌّ لَئِـــيْمٌ 'মুমিন হয় সরল ও ভদ্র, পক্ষান্তরে পাপী হয় ধূর্ত ও দুশ্চরিত্রের *(তাহক্বীক্ব আবূ দাঊদ হা/৪৭৯০, সনদ হাসান)*।

রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ وفى رواية لمسلم جَوَّاظٍ زَنِيْمٍ مُتَكَبِّـــرٍ– 'আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নাম বাসীদের সম্পর্কে সংবাদ দিব না? তারা হচ্ছে অনর্থক কথা নিয়ে বিবাদকারী, বদ মেজাজী, অহংকারী' *(মুত্তাফাক্ব আলইহ)*। মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে তারা হচ্ছে বদ মেজাজী, কুখ্যাত, অহংকারী *(মিশকাত হা/৪৮৮৯, ৯/১৭৬, ক্রোধ ও অহংকার অনুচ্ছেদ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَىَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ قَالَ «الْمُتَكَبِّرُونَ».

'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিরা আমার নিকট ঘৃণ্য ও ক্বিয়ামতের দিন আমার নিকট থেকে দূরে অবস্থান করবে যারা বাচাল, নির্লজ্জ ও মুতাফাই-হিকুন। ছাহাবীগণ বললেন, বাচাথ ও নির্লজ্জ তো বুঝলাম। কিন্তু মুতাফাইহিকুন কারা, হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বলেন, অহংকারীরা *(তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/২০১৮, সনদ ছহীহ)*। কোন মানুষের গঠন-আকৃতি, পোষাক-আষাক নিম্নমানের হলেই তার বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে হেয় মনে করা উচিত নয়। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! পুরুষরা যেন পুরুষদের ঠাট্টা না করে। হতে পারে (যাদেরকে ঠাট্টা করা হচ্ছে) তাদের মধ্যে এদের চেয়ে উত্তম লোক আছে। আর মহিলারা যেন মহিলাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তাদের মধ্যে এদের চেয়ে ভালো লোক আছে *(হুজুরাত ১১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ মনে করে *(মুসলিম,* রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করব। (১) যে আমার সাথে ওয়াদা করে ভঙ্গ করে (২) যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে (৩) যে ব্যক্তি কোন শ্রমিক নিয়োগ করে কাজ আদায় করে কিন্তু তার মজুরী পরিশোধ করে না *(বুখারী, ৪/৯১; 'ওয়াদা খেলাফ করা হারাম' অনুচ্ছেদ)*। ক্বিয়ামতের দিন ওয়াদা খেলাফকারীর জন্য তার ওয়াদা খেলাফের মাত্রা অনুযায়ী দুই নিতম্ব বরাবর পতাকা উত্তোলন করা হবে *(ঐ, হা/১৫৮৬, ৪/৯১)*। আর বলা হবে এটি অমুকের ওয়াদা খেলাফের পতাকা *(ঐ, হা/১৫৮৫, ৪/৯০)*।

কোন মানুষকে বিনা কারণে কষ্ট দেয়া ও তার দোষ খোঁজা মন্দ স্বভাব। তার পরিণতিও মন্দ। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِيْنًا– 'যারা মুমিন নর-নারীকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা অতি বড় মিথ্যা দোষ ও জঘন্য পাপের শাস্তি তাদের নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নেয় *(আহযাব ৫৮)*।

আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখ হওয়া মন্দ স্বভাব। আর তার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তার সহচর হিসাবে একজন শয়তান নিয়োগ করেন। আর শয়তান যার বন্ধু হয় তার মন্দের ব্যাপারে আর কি-ই-বা বলা প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ 'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য নিয়োগ করি এক শয়তান। আর সে হয় তার বন্ধু' *(যুখরুফ ৩৬)*। শুধু তাই নয়, এমন ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠবে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى– قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا– 'যে আমার স্মরণে বিমুখ, তার জীবন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠাব। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন' *(ত্বহা ১২৪, ১২৫)*।

মানুষের মন্দ স্বভাব ও তার পরিণতির যৎসামান্যই এখানে উদ্ধৃত হল। আসল কথা এগুলোর একেকটির পৃথক পৃথক প্রবন্ধ হওয়া প্রয়োজন। যাই হোক, হাদীছগুলো থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তির মন্দ স্বভাব, চাই তা কাউকে হত্যা করার মত জঘন্য অপরাধ হোক কিংবা বদ মেজাজের মত ব্যক্তিগত দোষই হোক পরিণামে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। নিয়ে যায় তাকে অনন্ত শাস্তির দিকে।

সুতরাং আমাদের মধ্যে যত ছোট-বড় বদ অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এগুলোকে গুরুত্বের সাথে নাফসে লওয়্যামার পর্যবেক্ষণে আনতে হবে। অতঃপর তাক্বওয়া নামক শক্তিশালী ক্লিনার দিয়ে ক্রমে এগুলো পরিস্কার করে ফেলতে হবে। যদি আমরা তাতে অক্ষম হই তাহলে উপরোক্ত হাদীছের পরিণাম ফল কারা ভোগ করবে?

আখলাকে হাসানার উপাদান :

মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আখলাক বিস্তৃত। আমলনামা শুরু হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এটি পরিব্যপ্ত। সে দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের আখলাক তার প্রতিটি কাজই। ফলে মানুষের ভাল-মন্দ গুণাগুণের শেষ নেই। তথাপি কিছু ভাল বা মন্দগুণের কারণে সে সমাজে উত্তম চরিত্র বা মন্দ চরিত্রে অভিহিত হয়। এমন কিছু উল্লেখযোগ্য উত্তম চরিত্রের উপাদান হচ্ছে- তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি, বিনয়-নম্রতা, সত্যবাদিতা, মিতভাষিতা, দানশীলতা, ছবর বা ধৈর্য, ক্ষমা-উদারতা, শোকর ও যিকির-আযকার, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, আল্লাহ্র উপর ভরসা করা, লজ্জাশীলতা, আমানতদারিতা, সুধারণা পোষণ, সৃষ্টিজীবের সকলের প্রতি সহনশীল হওয়া, আদল-ইনছাফ প্রভৃতি।

সমাপনী :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَضَحِكَ فَقَالَ « هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ ». قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِى مِنَ الظُّلْمِ قَالَ يَقُولُ بَلَى. قَالَ فَيَقُولُ فَإِنِّى لاَ أُجِيزُ عَلَى نَفْسِى إِلاَّ شَاهِدًا مِنِّى قَالَ فَيَقُولُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا – قَالَ – فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ فَيُقَالُ لأَرْكَانِهِ انْطِقِى. قَالَ فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ – قَالَ – ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلاَمِ –قَالَ – فَيَقُولُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا. فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ– 'একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ছিলাম, হঠাৎ তিনি হেসে ওঠলেন, এমনকি তাঁর দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে পড়ল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান আমি কেন হাসলাম? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামত দিবসে বান্দা তার প্রতিপালকের সাথে তর্কে লিপ্ত হবে; একারণে আমি হেসেছি। সে বলবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমাকে যুলুম থেকে রক্ষা করেননি? আল্লাহ বলবেন, কেন নয়, অবশ্যই। সে বলবে, আমার জন্য আমি ব্যতীত অন্য কাউকে সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করব না। আল্লাহ বলবেন, আজকের দিনে তোমার হিসাবের জন্য তুমিই যথেষ্ট। আর সম্মানিত ফেরেশতাগণ সাক্ষী হিসাবে থাকবে। অতঃপর তার মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, কথা বল। অতঃপর তারা তার আমল সম্পর্কে বলে দেবে। অতঃপর তার যবান খুলে দেয়া হবে। সে বলবে, দূর হও, অভিশাপ তোমাদের জন্য। তোমরা আমার শত্রু হয়ে গেলে? অথচ তোমাদের জন্যই আমি ঝগড়া-বিবাদ করছিলাম *(মুসলিম, মিশকাত/ ৫৫৫৪)*।

কি ভয়ংকর হাদীছ! আদর-যত্নে লালিত, বিলাস-ব্যসনে পরিবেষ্টিত, সুদৃষ্টিতে সংরক্ষিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এই আচরণ! সার্বক্ষণিক সাথী দেহের এই নিষ্ঠুর নির্দয় ও বিরুদ্ধ সাক্ষ্য প্রদান কতই না মর্মান্তিক। আর তা বান্দার অস্বীকার করার কোন উপায় থাকবে না। দুশ্চরিত্রের সাঁড়াশি যেভাবে মানব জাতির শ্বাসরোধ করে রেখেছে তাতে সেদিন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? নিজ ঘরের নীরব কোণে একাকী বসে সে ব্লু ফিল্ম দেখেছে, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ই-মেইল প্রভৃতি প্রযুক্তি ব্যবহার করে কত মন্দ কাজে জড়িত হয়েছে, মোবাইলে কত পাপ বিজড়িত কথা বলেছে, কত ভ্রান্ত-বাতিল পরিকল্পনা করেছে! কেউ দেখেনি, কেউ শুনেনি। কারো দেখার বা শুনার অধিকারও ছিল না। আজ কি-না তা বিশ্ববাসীর নিকট ওপেন সিক্রেট! এমন অনিবার্য, অলংঘণীয় কঠিন দিনের উপস্থিতির স্মরণে মুমিন হৃদয় ডুকরে না কেঁদে পারে? যে স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, আমল মানুষকে এমনতর বিপদ ও অপমানের বদ্ধভূমিতে নিক্ষেপ করবে, আমরা তা থেকে হাতজোড় করে আমাদের রবের নিকট পানাহ চাই। আর যে চরিত্র ক্বিয়ামতের দিন মিযানকে হেলিয়ে দিয়ে বান্দার মুখ উজ্জ্বল করবে, অনাবিল জান্নাতী সুখানুভূতিতে অবগাহন করাবে, আমরা সে চরিত্র অর্জনের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করি। আল্লাহ তুমি সহায় হও। আমীন!!

মানব সমাজে শিরক প্রসারের কারণ

-ইমামুদ্দীন

ইবাদতে-আমলে তথা শারঈ বিষয়ে স্রষ্টার সাথে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর অংশদারিত্ব স্থাপন করাই হল শিরক। যা সর্বাবস্থায়ই পরিত্যাজ্য। এই বিশ্বচরাচরে পাপ নামক যা কিছু আছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় হল মহান আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন লোকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলল, হে বৎস, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক মহা পাপ' *(লোকমান ১৩)*। আর তা ক্ষমার অযোগ্য পাপ। এই পাপ কারো দ্বারা সংঘটিত হলে স্পেশালভাবে তাকে আল্লাহ্র নিকট অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে হবে,অন্যথা তার ক্ষমা হবে না। এমন একটি ভয়াবহ পাপ শিরক মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অক্টোপাসের মতো জেঁকে বসেছে। যা থেকে বেঁচে থাকা মানুষের জন্য বেশ কষ্টকর। মানব জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে এমন জঘন্যতম পাপ অহরহ ঘটে চলেছে। আসলে এর পিছনে মৌলিক কারণ কি? কেনই বা সমাজে শিরক সম্প্রসারণ লাভ করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে মানব সমাজে শিরক প্রসারের কারণ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপননের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

১. তাওহীদভিত্তিক জ্ঞানের অভাব : মানব সমাজে শিরক প্রসারের অন্যতম কারণ হল তাওহীদ শিক্ষার অভাব। প্রত্যেক নবী ও রাসূল এই ভূপৃষ্ঠে এসেছিলেন মানুষকে তাওহীদ শিক্ষাদানের জন্য। সমাজের বুকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মৌলিক দায়িত্ব তারা অকাতরে পালন করতেন। তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র যমীনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'বলুন, হে কিতাবীগণ! এস একটি কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না; আর কোন কিছুতেই তাঁর সাথে শরীক করব না *(আলে ইমরান ৬৪)*। নবী বা রাসূলগণ তাওহীদের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য বারংবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন *(নাহল ৩৬)*। কালপরিক্রমায় মানুষের মধ্যে তাওহীদভিত্তিক জ্ঞানের অভাবে শিরক দ্রুততার সাথে সর্বস্তরে প্রসার লাভ করেছে। তাওহীদ ও শিরক সুমেরু ও কুমেরুতে অবস্থানকারী বিপরীতমুখী দু'টি জিনিস। এই দুয়ের সহাবস্থান কোন দিনই সম্ভব নয়, মানুষ যত তাওহীদ বিমুখ হবে শিরক ততই স্কন্ধে আসন গেঁড়ে বসবে। এটাই চিরন্তন সত্য। আর হয়েছেও তাই। শিরকের গ্যাড়াকল থেকে পরিত্রাণের জন্য আজও প্রয়োজন তাওহীদভিত্তিক জ্ঞানের প্রচার-প্রসার। মানুষের হৃদয়পটে তাওহীদের জ্ঞান মজবুত হলে কোন ভাবেই তার কাছে শিরকের মত পাপের কাজ স্থান পাবে না।

২. একাধিক স্রষ্টায় বিশ্বাস করা : মূর্তিপূজারী ও ত্রিত্ববাদীরা তাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের কারণেই একাধিক মা'বূদের ইবাদত করতে বাধ্য হয়েছে। যেমন ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম বিশ্বাসের তিনজন চিরন্তন ভগবানের বিশ্বাস মৌলিকভাবেই রয়েছে; যা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশমান। যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। আর খৃষ্টবাদের এই ত্রিত্ববাদী বিশ্বাসই প্রকট। আর তারা হলেন, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। জরথুস্ট ধর্মে দুজন মা'বুদে বিশ্বাস রাখা হয়। ইয়াজদান ও আহরিমান। *(ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৫, পৃ. ২৩০)*। মানব মনে এরূপ একাধিক স্রষ্টার ধারণাই শিরকের প্রসার ঘটতে সহায়তা করেছে। অথচ মহান আল্লাহ এসব বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে বলেন, 'ইবরাহীম বলল, তোমরা তো আল্লাহ্র পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে। পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরে অভিসম্পাত দিবে। তোমার আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না; *(আনকাবুত ২৫)*।

৩. পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ : পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ ও মুসলিম সমাজে শিরক বিস্তারের অন্যতম একটি কারণ। সাধারণত একজন মানুষ স্বীয় পূর্বপুরুষদেরকে সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। সাথে সাথে যেগুলোকে তারা সত্য বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাসও করে। একটিবারের জন্যও ভেবে দেখে না যে তাদের পূর্ব পুরুষগণ যা করেছে তার সবগুলোই কি ঠিক? তারা অন্যের দারস্থ না হয়ে নিজ জ্ঞানেই মনে করে স্বীয় পূর্বপুরুষদের সবই ঠিক। ফলে অন্যরা প্রকৃত সত্যটি তাদের নিকট উপস্থাপন করলে সেটাকে তারা কোনভাবেই মেনে নিতে চায় না। তারা যাচাই–বাছায়ের প্রয়োজনও মনে করে না। বরং তারা সত্যটাকে প্রতিহত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। পূর্বপুরুষদের অনুসরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'এইভাবে তোমরা পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমি কোন সর্তককারী প্রেরণ করেছি তখন তাদের সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি। সেই সতর্ককারী বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে যে পথ পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ নির্দেশ আমি তবুও কি তোমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করবে? তারা বলত, তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা প্রত্যাখ্যান করি' *(যুখরুফ ২৩-২৪)*। এভাবে পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে শিরকের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। তাদের কোনভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলে তারা কোন কিছু না ভেবে সরাসরি বাপ-দাদার দোহায় দিয়ে প্রকৃত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। পূর্বপুরুষদের দোহাই দেয়া মূলত জাহেলী সমাজের মক্কার কাফের-মুশরিকদের গর্বিত কাজ। যা বর্তমানে মুসলিম সমাজে প্রবিষ্ট হয়েছে।

৪. বিধর্মীদের অনুসরণ : বিভিন্ন ধর্মের মানুষ পর্যায়ক্রমে ইসলামী ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। কিন্তু পূর্ব ধর্মের আদর্শের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে থেকেই গেছে। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমগণ এক সময় অধিকাংশরা হিন্দু ধর্মসহ বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। কালের আবর্তে ইসলামের সুমহান আদর্শের ছায়াতলে তারা আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কিন্তু যথপোযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে পূর্ব ধর্মের

আদর্শের অনুসরণ তারা শতভাগ ছাড়তে সক্ষম হয়নি। ফলে পূর্ব ধর্মের পালনীয় আদর্শের অংশবিশেষ ইসলাম ধর্মের আদর্শের সাথে তালগোল পাকিয়ে তারা পালন করতে থাকে। আবার অনেক সময় বিধর্মীদের আদর্শের প্রচার-প্রসারের প্রভাবে ও তাদের জৌলুসে প্রভাবিত হয়ে স্বীয় আদর্শকে মাটিচাপা দিয়ে সানন্দে তাদের আদর্শকে গ্রহণ করেছে। আর এভাবে শিরক নিজ গতিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। অনেক মানুষ বিধর্মীদের সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুসরণ করতে গিয়ে শিরকের জালে আবদ্ধ হয়েছে। অথচ হাদীছে এসেছে,

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقـــوم فهـــو منهم– ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুসরণ (সাদৃশ্য) করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭, হাদীছ ছহীহ)*। বিধায় আমাদের সকলের উচিৎ বিধর্মীদের আদর্শের অনুকরণ করা থেকে সাবধান থাকা। নচেৎ পরকাল হারাতে হবে। বিধর্মীদের কৃষ্টি-কালচার মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে শিরকের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। এক্ষেত্রে মিডিয়া সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করছে। আর মুসলিম সমাজ গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে শিরকের অথৈ সাগরে পথ হারা মাঝির ন্যায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। বিধায় বিধর্মীদের অন্ধ অনুকরণ থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে।

৫. ভালবাসায় বাড়াবাড়ি : মানুষ অনেক সময় ভালবাসার আতিশয্যে

শিরকের মধ্যে নিপতিত হয়। প্রিয়জন বা সম্মানী ব্যক্তিদের ভালবাসা প্রদর্শন করতে গিয়ে এমন কিছু শব্দ-বাক্য তার শানে ব্যবহার করে যেগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম সমাজে শিরক প্রসারে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাথে সাথে সে ভালবাসার মানুষটির সাথে এমন কিছু আচরণ প্রদর্শন করে যেগুলো শিরকের শামিল। বিশেষ করে ওলী বা পীর নামে পরিচিত ব্যক্তিদের সাথে যা করা বলা যায় প্রায় তার সবগুলোই শিরক। ক্ষেত্রবিশেষে পীরকে সিজদা পর্যন্ত করা হয় স্রেফ ভালবাসা প্রদশনার্থে। আবার এই ভালবাসার নিদর্শন দেখাতে গিয়ে তাকে কদমবুসী, এমনকি তার শরীর ধোঁয়া গোসলের পানি ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। এমনকি তাকে কখনো কখনো আল্লাহ্র আসনে বসিয়ে ফেলে। *নাঊযুবিল্লাহ!* যেসব গুণাবলী মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ। যা কখনোও মানুষের স্বভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। স্রেফ আল্লাহ্র গুণাবলী মধ্যে যা সীমাবদ্ধ, সে গুণাবলী দিয়ে ভক্তরা তাকে আহ্বান করে তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকে। এগুলোর দ্বারা যে শিরক করে চলেছে, সে বিষয়ে সামান্যতম দৃকপাত করে না। তার প্রশংসা করতে গিয়ে সীমাতিক্রম করে ফেলে। অথচ খেয়াল করে না যে প্রশংসায় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, খৃষ্টানরা মরিয়মের পুত্র ঈসা (ছাঃ)-এর প্রশংসায় যেভাবে বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আমার ব্যাপারে অনুরূপ বাড়াবাড়ি কর না। প্রকৃতপক্ষে আমি তো আল্লাহ্র একজন বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূলই বল *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮৯৭)*। অতিরঞ্জিতভাবে কারো প্রশংসা করা বা ভালবাসা প্রদর্শন জায়েয নয়। খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-এর প্রতি অধিক ভক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে তাঁকে মা'বুদ এবং আল্লাহ্র পুত্র ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করেছে, যা স্পষ্ট শিরক। সুতরাং আমরাও যেন আবেগে আপ্লুত হয়ে নাছারাদের ন্যায় আমাদের প্রিয় নবীর প্রশংসায় সীমালংঘন না করি, যে বিষয়ে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে দিয়েছেন অত্র হাদীছের মাধ্যমে। যেখানে নবীকুল শিরোমণি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অতি ভক্তি বা প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা গর্হিত কাজ, সেখানে বর্তমানে পরী বা অলি-আওলিয়ার ক্ষেত্রে ভালবাসায় বা প্রশংসায় বাড়াড়াড়ি করার ভয়াবহতা কত বেশি তা বোধ সম্পন্ন মানুষের নিকট পরিস্কারভাবে অনুমতি।

৬. অসীলা মানা : বর্তমান সময়ে মানব সমাজের অনেকে অসীলা এর ধোঁকায় পড়ে শিরকের গোলাকধাঁধায় বন্দি হয়েছে। এ পথের অনুসারীগণ মনে করে অসীলা হল সুপারিশকারী। অসীলা ব্যতীত জান্নাতে যাওয়া যাবে না। কারণ দুনিয়ার আদালতে বিচারপ্রার্থী হলে জজের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য উকিল ঠিক করা হয়। উকিল ছাড়া জজ পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়। বিধায় আল্লাহ্র বিচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উকিল বা অসীলা ধরা যরূরী। কোন পীর বা অলি-আওলিয়াকে অসীলা হিসাবে মান্য না করলে কোন ব্যক্তি নাজাত পেতে পারে না। এজন্য তারা জীবিত পীর তো দূরের কথা মৃত পীরকেও বেশির ভাগ সময় অসীলা হিসাবে গ্রহণ করে। এর দ্বারা তারা আল্লাহ্র সত্তাকে জজের সাথে একাকার করে ফেলেছে। অথচ আল্লাহ তাআলা সর্বাবস্থায় সবকিছু দেখেন ও শুনেন। তার নিকট পৌঁছতে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। বান্দা যেখান থেকে যে অবস্থায় তাঁকে স্মরণ করবে তিনি তাতে সাড়া দিতে শতভাগ সক্ষম। এই অসীলার দোহায় পেড়ে হাযার হাযার মানুষ শিরকের মহাপাপে জড়িয়ে পড়েছে। মৃত ব্যক্তির কিছুই করার নেই। মৃত ব্যক্তির কারো কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনিও কারো কিছু শুনতে বা জানতে পারেন না *(ফাতির ২২)*। অথচ মানুষ মৃত পীর বা আলি-আওলিয়ার কাছে অহরহ নযর-নেয়ায মানছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'অসীলা' অর্থ নৈকট্য (القربـــة)। ক্বাতাদাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন অন্বেষণ কর তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে এবং এমন আমলের মাধ্যমে যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন *(তাফসীর ইবনে কাছীর, ২/৫৫ পৃ.)*। অসীলার লক্ষ্য হবে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক

Contents

ইবাদত করা। কিন্তু মানুষ অসীলাকে অপব্যাখ্যা করে শিরক-এর অতল গহবরে তলিয়ে গেছে।

৭. পাপ মোচনের ভ্রান্ত ধারণা : পাপ মোচনের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকেও শিরক মুসলিম সমাজে বিস্তার লাভ করেছে। পীর বা আওলিয়ার নিকট মানত করলে মনের আশা পূর্ণ হবে। সাথে সাথে পাপ মোচন হবে। সেখানে ছাদকা দিলে রুটি-রুযীতে বরকত হবে। সংসারে অভাব হবে না। পরীক্ষার ভাল ফলাফল লাভ করা যাবে। জীবন চলার পথে বালা-মুসিবত বিদূরিত হবে– এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস মানুষকে শিরক করতে উৎসাহিত করেছে। আর এই নীতি-আদর্শগুলো সমাজের বুকে ছড়িয়ে দেয়াকে তারা পুণ্যের কাজ জ্ঞান করে মানুষেরা মনে করেছে পরী বাবাকে খুশি করতে পারলে পীর বাবা হাশর-পুলছিরাত-কিয়ামত দিবস সবকিছু পার করে দিবেন। এভাবে তারা এমন শিরকী আক্বীদাকে আঁকড়ে ধরেছেন।

৮. কবরকে ইবাদতের স্থান গণ্য করা : অনেক মানুষ কবরকে ইবাদতের স্থান হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। ফলে কবরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে মসজিদ, খানকাহ, মাযার ইত্যাদি। সমানতালে মসজিদ ও মাযারে চলছে সিজদা। যদিও বা মাযারের গায়ে লিখা আছে, এখানে কেউ সিজদা করবেন না। সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে যেমন লেখা থাকে, 'সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' ধূমপানে মৃত্যু আনে' এরূপ শ্লোগান যেমন ধূমপায়ীকে ধূমপানে অধিক আগ্রহী করে তোলে। ঠিক তেমনি মাযারে লেখা ঐ শ্লোগান মাযার ভক্তদের সিজাদর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং একাজে তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করে। মানুষ দ্বিধাহীনভাবে কবরের নিকট পাড়ে গিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করে, দো'আ বখশানো, সিজদা দেয়, নযর-নেয়ায, কবরে চুম্বন ও তাতে শরীর জামা কাপড় স্পর্শ করছে। আবার এ কাজগুলোকে ছওয়াবের কাজ বলে জ্ঞান করছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদেরকে পূর্বেকার লোকেরা তাদের নবী ও নেককার ব্যক্তিদের বকরগুলিকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা যেন তা করো না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে নিষেধ করে যাচ্ছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩)*। ইহুদী নাছারাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছিল' *(মুসলিম হা/১১৮৫)*। মহানবী (ছাঃ)-এর তরফ থেকে কবরকে মসজিদের মর্যাদা দেয়া নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তারা এরূপ করায় শিরক সমাজের মাঝে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে।

৯. কবরপূজকদের কল্পিত কাহিনী : কবরপূজারীরা কিছু কল্পিত কাহিনী রচনা করে মানুষের মাঝে প্রচার করার ফলে মানব মনে তা আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। বানোয়াট, ভীত্তিহীন কিছু গাল-গল্পকে আশ্রয় করে মাযারের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হয়েছে। মাযারে বাবার কাছে গেলে মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে। যা চাইব তাই পাবে। পীর বাবার সন্তুষ্টিতে তার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ভরশীল মর্মে মাযারপূজারীরা জনগণের নিকট অলিক গল্প প্রচার করে। যার ফলে মানুষ আস্তে মাযারমুখী হয়েছে। সব কিছু ঢেলে দিচ্ছে বাবার পদচরণে। তারা তাদের বাবার শানে এমন কিছু অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা দিয়ে থাকে যা অনেক ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণেরও শানের খেলাফ, যেমন কোন কোন পীর বাবা কাবা শরীফ থেকে হাযার কিলোমিটার দূরে স্বীয় মাযারে অবস্থান করেও কাবা ঘরের পাশে বিচরণকারী কুকুর খেদানোর ঘটনাও ঘটিয়ে থাকেন। স্রেফ এ সব ভূয়ামী নিজের পাণ্ডিত্য যাহির করার জন্যেই করে থাকে। এসব অলিক গল্প আবার মানব মনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। ফলশ্রুতিতে শিরক সমাজে তরতরবেগে প্রসারিত হয়ে থাকে।

১০. মিথ্যা হাদীছের প্রপাগাণ্ডা : কবরপূজারীরা মানুষকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করা ও নিজেদের কুকর্মের সমর্থনে অগণিত হাদীছ বানিয়ে সমাজে চালু করেছে। আবার তারা এসবই হাদীছকেই নিজের পক্ষে দলীল হিসাবে জনসমক্ষে পেশ করে থাকে। তাদের এসব বানোয়াট হাদীছ শিরকের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। যেমন তাদের একটি বানানো হাদীছ হ'ল– إذ تحيرتم فى الامور فاستعينوا باهل القبور 'যখন তোমরা কোন ব্যাপারে পেরেশান বা কিংকর্তব্যমিমূঢ় হয়ে পড়, তখন কররববাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর' *(শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী, আল-বালাগুল মুবীন, অনু: মাওলানা কারামাত আলী নিযামী (ঢাকা : শিরীন পাবলিকেশন্স, ১৩৮৬ হিঃ), পৃ. ৮৯)*। এসব হাদীছ বানিয়ে তারা মানুষকে কবরপূজারী বানাতে সক্ষম হয়েছে। সাথে সাথে তারা এই নোংরা কর্মকে দলীল দ্বারা সাব্যস্ত করার জন্য মহানবী (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করবে সে যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাত করেছে' মর্মে হাদীছ জাল করেছে *(নাছিরুদ্দীন আলবানী, অনুবাদ : আবু শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন, যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ (ঢাকা : ইসলামী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, ২০০৪ ইং), পৃ. ৯৫)*। এরূপ জাল হাদীছ প্রচলিত থাকার কারণে শিরক প্রসারিত হয়েছে বেশী।

১১. বিনা পরিশ্রমে অধিক ছওয়াব লাভ : কোন প্রকার পরিশ্রম ছাড়াই অধিক ছওয়াব লাভের প্রত্যাশা বা অল্প কিছুর বিনিময়ে অনেক কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা মানুষকে শিরক করতে উৎসাহিত করে। পীর বাবার মাযারে কিছু ছাদকা করলে বাবা জান্নাতে যাওয়ার সকল পথ সহজতর

করতে সাহায্য করবেন। সন্তানহীন নারী পীর বাবার মাযারে মানত বা কিছু দান করলে সন্তান ফিরে পাবে। কিছু হারিয়ে গেলে মাযারে শরণাপন্ন হলে তা খুঁজে পাওয়া যাবে। মাযারে বসে অল্প সময় যিকির করলে গোনাহ মাফ হবে বা অনেক নেকি পাওয়া যাবে। ব্যবসায় উন্নতি হবে। যাত্রাপথে পীরের কবরে কিছু দান করলে রাস্তায় যাবতীয় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। পৃথিবীতে ফরয ইবাদতগুলো সঠিকভাবে আদায় না করেও যদি কোন পীর মানা যায় তাহ'লে পরকালে পীরের অছীলায় নাজাত পাওয়া যাবে। পীরের শেখানো মন্ত্র মুখে আওড়ালে ছালাত না পড়েও ছালাত আদায়ের চেয়ে বেশি ছওয়াব পাওয়া যাবে। ওরসে যোগ দিলে ওমরার ছওয়াব পাওয়া যাবে বা পূর্বের পাপগুলো ক্ষমা করা হবে। কোন পীরের মুরীদ না হলে জান্নাত

যাওয়া সম্ভব হবে না। জীবনে অনেক পাপ করে থাকার পরেও কোন শক্ত পীরের মুরীদ হতে পারলে পীর ছাহেব তাকে সাথে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এসব ভ্রান্ত ধারণার জন্য মানুষ শিরকের পথে পা বাড়ায়। যা শিরক সম্প্রসারিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১২. রাজনৈতিক ফায়দা লাভ : রাজনৈতিক ফায়দা লাভের উদ্দেশ্যেও সমাজে শিরক প্রসার লাভ করেছে। যেমন, কোন বড় মাপের রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুর পর তার মৃত্যুবার্ষিকীতে দলবল নিয়ে পুষ্পস্তবক প্রদান করা এবং সাথে সাথে তা বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার করার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মধ্যে অনুরূপ শিরক করার প্রবণতাকে জাগিয়ে তোলে। নেতাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন, তার স্মৃতিচারণের নিমিত্তে রাস্তার মোড়ে তার প্রতিকৃতি স্থাপন, তাদের কবরকে কেন্দ্র করে স্মৃতিস্তম্ভ বা সৌধ নির্মাণ। আগরবাতি, মোমবাতি জ্বালানো, নেতার প্রতিকৃতিতে ফুলের মালা পরিয়ে শ্রদ্ধার নিদর্শন প্রদান, তাদের ছবি তৈরী করে অফিস-আদালত, ঘর-বাড়ী, দোকান-পাটে টাংগানো, তাদের ছবিকে সম্মান প্রদান ইত্যাদি কর্ম সম্পাদন করে রাজনৈতিক নেতারা খুব সহজেই প্রভাব বিস্তার করে। রাজনৈতিক নেতা নিজেদের খ্যাতির মানসে এগুলো আবার মিডিয়ায় প্রচার করে। ফলে মানুষ সেগুলো দেখে তাদের মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। এভাবে শিরক রাজনৈতিক নেতাদের মাধ্যমেও সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে।

১৩. অর্থনৈতিক ফায়দা হাছিল : শিরকের আখড়া মাযারগুলোতে বর্তমানে জমজমাট ব্যবসা শুরু হয়েছে। কোন প্রকার পুঁজি বিনিয়োগ ছাড়াই প্রতিদিন আয় হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। গরু-খাসিসহ খাদ্য সামগ্রীর কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। বড় বড় ব্যবসায়ী ও কোটিপতিরা পরকালের অসীলা মেনে পীরের কছে প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ টাকা, গরু, খাসি, মুরগি আরো কত কি দান করছে। আবার গরিব, দুঃখীরা এ থেকে পিছপা নয়। তারা তাদের কষ্টার্জিত টাকা-পয়সা নিজে ভক্ষণ না করে ছওয়াবের আশায় ঢেলে আসছে বাবার মাযারে। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বিভিন্ন ব্যস্ততা ও অলসতার কারণে তেমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করতে পারে না। তাই তারা মাযারে মাযারে ছুটাছুটি করে বেড়ায়। আবার কেউ কেউ কবরের আযাব লঘু হওয়ার গহীন প্রত্যাশায় মাযার চত্বরে তার দাফনের তিন হাত জায়গা বরাদ্দ দেয়। কেউবা আবার ভাল চাকরীর আশায়, কেউ ফলাফল, কেউ রোগ মুক্তি, কেউ জিনের আছর থেকে বাঁচার নিমিত্তে মোটা অংকের দান মাযারে করে। আর মাযারের খাদেম ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিনা পুঁজির ব্যবসায় লভ্যাংশ গুণতে থাকে মনের সুখে। বিনা পরিশ্রমে দুমুঠে। যেন সেটা একটা ল্যাংড়া, খোড়া-পাগলাশ্রাম। আর এই বিনা পুঁজি ব্যবসাকে গতিশীল করার জন্য তারা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমকে কাজেও লাগায়। এভাবে শিরক সমাজের সর্বস্তরে ছেড়ে যায়।

১৪. রোগ মুক্তির আশা : রোগ মুক্তির আশায় মানুষ অনায়াসেই শিরকের সাথে জড়িয়ে পড়ে। দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে কোন প্রকারের চিকিৎসা নিতে সে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। ফলে ছুটে যায় বাবার মাযারে তেলপড়া, পানি পড়াসহ বিভিন্ন ঔষধ নিতে। বাবার দেয়া বাহারি তাবিজ গলায় হাতে-পায়ে পেটে বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। যার প্রভাব অন্যদের মাঝে ক্রিয়া করে। কেউ আবার রোগ মুক্তির আশায় অষ্টধাতুর আংটি, তামার বালা-চুড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়। এভাবে শিরক তার রাজত্ব কায়েম করতে থাকে।

১৫. গণসচেতনতার অভাব : গণসচেতনার অভাব শিরক প্রসারের অন্যতম একটা কারণ। কারণ যারা শিরক করে বা শিরকী প্রতিষ্ঠান মাযার-খানকাহর সাথে জড়িত, তাদের কাছে এসব শিরকী কর্মকাণ্ড সম্পাদনের উপযুক্ত প্রমাণ চাওয়া হলে এভাবে শিরক প্রসার লাভ করতে পারত না। যারা তাবিজ-কবজ তৈরী ও বিক্রি করছে তাদের নিকট এর বৈধতার দলীল চাইলে এমনিতেই এসব পথ সংকুচিত হয়ে পড়ত। শিরকের বিরুদ্ধে গণসচেনতা সৃষ্টিতে জুম'আ মসজিদের ইমামগণ সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা জুমআ'র খুৎবায় মানুষকে শিরক-এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করতে পারলে জনগণই শিরকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ফলশ্রুতিতে শিরক সম্প্রসারণের সকল পথ পর্যায়ক্রমে সংকুচিত হয়ে পড়বে।

শেষ কথা : মানুষ যে যা বলে তাই মানতে গিয়ে অনেক সময় শিরকের চোরাবালিতে ব্যক্তি নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তখন মহান আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ ছাড়া সে সঠিক পথের দিশা ফিরে পায় না। শিরক সমাজে প্রসারের জন্য যত পথ খোলা আছে তা বন্ধ করার জন্য তত পথ নেই। প্রায় মানুষ জেনে বা না জেনে শিরক করে চলেছে। জ্ঞানগত, উপসনাগত, ইবাদতগত ও অভ্যাসগত শিরকের মহাসাগরে মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে। বলা মুশকিল শিরকের মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তাওহীদের ভেলায় চড়ে কখন তারা কুলে ভিড়বে। না সাগরবক্ষে সলিল সমাধি লাভ করবে। যার শেষ ঠিকানা জাহান্নাম।

মহানবী (ছাঃ) শিরক থেকে সাবধানতা অবলম্বনের কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'আমি তোমাদের জন্য যে ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশি ভয় করছি তা হল ছোট শিরক-রিয়া বা লোক দেখানো কাজ-কর্ম *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫২৩৪)*। অন্যত্র বলেন, 'আমি তোমাদের জন্য দাজ্জালের চেয়ে বেশি আশংকা করি শিরকে খফী, আর তা হল কোন ব্যক্তি ইবাদতে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে, আমি তাকে তার শিরকসহ বর্জন করি। অপর বর্ণনায় আছে তার আমার কোন সম্পর্ক নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩১৫)*। শিরকের ভয়াবহতা খুবই কঠিন। যার শেষ পরিণতি জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। আমাদের অবশ্যই তাওহীদভিত্তিক জ্ঞানলাভ করে শিরককে বর্জন করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

আহলেহাদীছ আন্দোলন : সংকট ও সংস্কার যুগে

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

দুনিয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাসে মুসলিম জাতি নানা ধরনের ফিৎনার সম্মুখীন হয়েছে এবং ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন রকম বিদ'আত ও কুসংস্কার ঢুকে পড়েছে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের নামে। কুরআন মাজীদকে পরিবর্তন করার কিংবা তাতে সন্দেহবাদ আরোপ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। রাসূলের ছহীহ সুন্নাতকে এড়িয়ে গিয়ে নতুন নতুন আমল চালু করার চেষ্টা করা হয়েছে। কখনো সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এসবের যে কোন একটিই দ্বীনের চিহ্নসমূহ মুছে দেওয়ার এবং তার মূলনীতি সমূহ বিনষ্ট ও ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আল্লাহ এ দ্বীনকে হেফাযত করেছেন এবং বিরোধীদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এজন্য তিনি যুগে যুগে যোগ্য বান্দা সৃষ্টি করে তাঁর দ্বীনকে পৃথিবীর বুকে অবিকৃত রেখেছেন। অন্যথা ইহুদী-নাছারাদের ন্যায় ইসলামও পৃথিবীর বুকে তার আসল চেহারা হারিয়ে ফেলতো। দ্বীনের হেফাযত তথা ইসলামের আদিরূপ বজায় রাখার আন্দোলনই আহলেহাদীছ। এ আন্দোলন ইসলামের মৌলিকত্বকে অক্ষুণ্ন রাখতে সদা সচেষ্ট। এজন্য তারা সকল বিদ'আতকে ছাটাই করার চেষ্টা করে, সকল ভ্রান্তি দূর করে দ্বীনকে হেফাযত করাই তদের সতত সাধনা। তাঁরা এ দ্বীনের অতন্দ্র পহরী হিসাবে বাতিল পন্থীদের বিরুদ্ধে খাঁটি দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হন। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা এ আন্দোলনের উত্তরসূরীরা এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছেন।

উল্লেখ্য যে, ৩৭ হিজরীর পর থেকে মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হতে শুরু করে। যার অশুভ পরিণতি আজো মুসলিম বিশ্ব ভোগ করছে। দলবিভক্তির সাথে সাথে শুরু হয় ইসলামের নামে বিভিন্ন মতবাদের উত্থান। এসব মতবাদের অধিকাংশ ছিল মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। যার কবলে পড়ে মানুষ তাদের ঈমান-আক্বীদা হারিয়ে শিরক ও কুফরের মত জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হয়। এ কারণে এটা ছিল মানুষের আক্বীদা বিধ্বংসী এক মারাত্মক যুগ। তাই এ যুগকে আমরা সংকট ও সংস্কার যুগ বলে অভিহিত করেছি। এ যুগের সময়কাল ছিল ১০০ থেকে ১৩২ হিজরী পর্যন্ত। মূলত এ যুগে আল্লাহ্র যাত ও ছিফাত তথা তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন ভ্রান্ত আক্বীদা সৃষ্টি হয়। এ যুগে প্রধানত চারজন বিদ্বানের দ্বারা চার ধরনের বিদ'আত প্রসার লাভ করে। সেগুলো নিম্নরূপ :

(১) সমরকন্দী (মৃত্যু ১২৮ হিঃ) কর্তৃক প্রচারিত 'জাহমিয়া' মতবাদ। এ মতবাদে আল্লাহ এক নির্গুণ সত্তা। কেবল আল্লাহকে জানার নাম হচ্ছে ঈমান। কুরআন সৃষ্টবস্তু, আল্লাহ্র কালাম নয়। মানুষের নিজস্ব কোন ইচ্ছাশক্তি নেই; বরং মানুষের দ্বারা আল্লাহ তাঁর কর্ম পরিচালনা করে থাকেন। অর্থাৎ বান্দার মাঝে আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রয়োগ ঘটে এবং বান্দার সকল কাজই আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুকূলেই হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই করার ক্ষমতা কারো নেই। মূলত সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়- এ কথার অপব্যাখ্যা করে তারা মানুষকে একটি দায়িত্বমুক্ত জড় পদার্থের ন্যায় কল্পনা করে। ফলে আল্লাহ্র অনুগত বান্দা ও অবাধ্য বান্দার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। ক্বাদারিয়া মতবাদের বিপরীত অদৃষ্টবাদী এ মতবাদটি 'জাবারিয়া' নামেও সমধিক পরিচিত।

(২) জা'আদ বিন দিরহাম খুরাসানী (মৃত্যু ১২৪ হিঃ)ও জাহম বিন ছাফওয়ানের মত একই মতবাদের ঘোর সমর্থক ও অতীব সক্রিয় প্রচারক। তিনি আল্লাহ্র ছিফাত তথা গুণাবলীকে অস্বীকার করেন। তাদের ধারণায় আল্লাহর সত্তার সাথে কোন গুণ যুক্ত করার অর্থ তাঁকে 'সাকার' (তাজসীম) ও বান্দার সাথে (তাশবীহ) সাদৃশ্য করা। তাদের মতে, আল্লাহকে গুণহীন সাব্যস্ত না করা অবধি তাওহীদে বিশ্বাস পূর্ণাঙ্গ হয় না। সাথে সাথে তিনি আল্লাহ্র আরশে অবস্থানের বিষয়টিও তিনি অস্বীকার করেন। তারা মনে করেন যে, আরশের উপরে আল্লাহ্র অধিষ্ঠান, আকাশের উপরে আরশের অবস্থান প্রভৃতিকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কারো তাওহীদে বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

(৩) ওয়াছিল বিন আতা বছরী (৮০-১৩১হিঃ) ছিলেন মু'তাযিলা মতবাদের উদ্ভাবক। জাহমিয়াদের মত এই মতবাদও (ক) আল্লাহকে গুণহীন নামীয় সত্তা মনে করে। তাদের মতে আল্লাহ্র সত্তা যেমন সনাতন (ক্বদীম), তেমনি তাঁর গুণাবলীকেও সনাতন মনে করলে শিরক করা হবে। সেকারণে তারা বলেন, আল্লাহ ইলম (জ্ঞান) ছাড়াই 'আলীম' (সর্বজ্ঞ), কুদরত (শক্তি) ছাড়াই 'ক্বাদীর' (সর্বশক্তিমান), হায়াত (জীবন) ছাড়াই 'হাই' (চিরঞ্জীব) ইত্যাদি। (খ) কুরআনকে সৃষ্টবস্তু বলে বিশ্বাস করে। (গ) এ মতবাদে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি মুমিনও নয়, কাফিরও নয়; বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। তারা তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে চিরস্থায় জাহান্নামী হবে। (ঘ) মানুষের লৌকিক জ্ঞানই তার ভাল-মন্দের মাপকাঠি এবং মানুষ

নিজেই তার ভালমন্দের স্রষ্টা। (ঙ) ওছমান, আলী, তালহা, যুবায়ের ও তাঁদের পক্ষে-বিপক্ষে যারা পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, তাদের একটি পক্ষ নিশ্চিতভাবে 'ফাসেক' হওয়ার কারণে জাহান্নামী এবং তাদের কারও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। জাহমিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি মতবাদ মূলত গ্রীক দর্শন থেকেই অনুপ্রবেশ করেছে।

(৪) মুক্বাতিল বিন সুলায়মান বলখী (মৃত্যু ১৫০ হিঃ) ছিলেন নির্গুণবাদী জাহমিয়া ও মু'তাযিলা মতবাদের বিপরীতে 'মুশাব্বিহাহ' বা সাদৃশ্যবাদী মতবাদের কথিত প্রবক্তা। তাঁর সম্পর্কে কোন কোন বিদ্বান ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে আল্লাহ্র গুণাবলী বান্দার গুণাবলীর সদৃশ। পরবর্তীতে মুহাম্মাদ বিন কাররাম (মৃত্যু ২৫৫ হিঃ) এ মতবাদের প্রচারে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করেন। তিনি আল্লাহকে সাধারণ প্রাণীদেহের সাথে তুলনা করেন।

এসব ক্ষেত্রে সঠিক আক্বীদা হচ্ছে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী এক ও অবিভাজ্য এবং তাঁর সত্তার সাথে তাঁর গুণাবলীকে অবিচ্ছিন্ন ও ক্বাদীম (সনাতন) বলে বিশ্বাস করা। কুরআন মাজীদ আল্লাহ্র কালাম, সৃষ্ট নয়; তাক্বদীরের ভাল-মন্দ; কবীরা গোনাহগার মুমিন, কাফির নয়; বান্দার ভাল-মন্দ সকল কর্মের মূল স্রষ্টা আল্লাহ, বান্দা আল্লাহ প্রদত্ত কর্মশক্তি প্রয়োগে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী প্রভৃতির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

এই সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাসকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্বীনকে হেফাযত করার জন্য আল্লাহ তাঁর এক শ্রেণীর বান্দাদের মনোনীত করেছেন। তারা একদিকে যেমন আল্লাহ ও তাঁর প্রতি যথার্থভাবে ঈমান এনেছেন, তেমনি কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরেছেন। আর দ্বীন বিরোধীদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে সর্বাত্মক সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন। দ্বীনের হেফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত আল্লাহ্র সেই বান্দারাই হচ্ছেন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাতের নিঃশর্ত অনুসারী আহলেহাদীছগণ।

বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে দ্বীনের উপর হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত এ শতাব্দীতে ইসলাম বৈরী শক্তি ইসলামকে প্রতিহত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। তারা মুসলিম উম্মাহ্র ইযযত-আব্রু রক্ষা ও বিজয়ের মূল সূত্র কিতাব ও সুন্নাতের প্রতি মুসলমানদের উদাসীনতা লক্ষ্য করেছে। ফলে তারা মুসলিম সন্তানদেরকেই দ্বীনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টির কাজে লাগিয়েছে। প্রথমে তারা নিজেদের সন্তানদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। অতঃপর মুসলিম ছেলেদেরকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে কাছে টেনে তাদের মগজ ধোলাই করেছে। ফলে এখন মুসলিম সন্তানরাই ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কথা বলে। মুসলমান এখন ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রু হয়ে গেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকেই ফিরে আসতে হবে এবং তার সিদ্ধান্তকে সবকিছুর উপরে স্থান দিয়ে তাকে অবনত মস্তকে মেনে নিতে হবে। তাহলে মুসলিম তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে দীর্ঘদিন পর নতুন অবয়বে যাত্রা শুরু করেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-নির্বাহী সম্পাদক

ঐতিহাসিক বালাকোটের যুদ্ধ : ঘটনাপ্রবাহ

-শিহাবুদ্দীন আহমাদ

ভূমিকা :

অষ্টাদশ শতকে ধূমকেতুর মত অনেকটা হঠাৎ করেই আরব বিশ্বে ইসলামী নবজাগরণের আলোকধারা চমকিত হয়। বিশেষত মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর সাথীদের পরিচালিত মুওয়াহ্হিদ আন্দোলন বিদ্যুৎ ঝলকের উদ্ভাসে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। সঊদী আরব, সিরিয়া ও মিসরের সালাফিয়্যাহ আন্দোলন, নাইজেরিয়ার ফালানী আন্দোলন, ইন্দোনেশিয়ায় পাদুরী আন্দোলন, ভারতীয় উপমহাদেশের তরীকায়ে মুহাম্মাদী আন্দোলন যা বালকোটের যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজয় বরণ করে ও পরবর্তীতে ক্ষীণ শক্তি নিয়ে ধিক ধিক করে জ্বলে থাকে। এবং বাংলাদেশে ফারায়েযী আন্দোলন সবই ছিল এই আন্দোলনেরই মহৎ ফলশ্রুতি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সুদূরাতীতকাল থেকেই বর্ণ, জাতি, গোত্র, ভাষা, ধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময়তায় ভারতীয় উপমহাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে এক অপার সম্ভাবনার দুয়ার নিয়ে বর্তমান। এজন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্ষমতাবান গোষ্ঠীসমূহ এ অঞ্চলকে সবসময় তাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু করে রেখেছে। ৭১২ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলামের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। তারপর থেকে সহস্রবছরাধিকাল ধরে মুসলিম শাসকরা নিরবচ্ছিন্নভাবে উপমহাদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাদের শাসনামলের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে নানাবিধ কথা থাকলেও এটা দ্বিধাহীনভাবে অনস্বীকার্য যে, তাদের আমলে সামগ্রিকভাবে ভারত উপমহাদেশ পূর্বকালের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক অনেক বেশি সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল। ষোড়শ শতক থেকে ইউরোপীয় বণিকের দল ভিড় জমাতে শুরু করে উপমহাদেশে। সেই থেকেই আক্ষরিক অর্থে এ অঞ্চলে বিদেশী আগ্রাসনের সূচনা। সর্বশেষ ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে ইংরেজ বণিকরা এ অঞ্চলে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃটিশ রাজদণ্ডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের উপর এক জোরজবরদস্তিমূলক আধিপত্যবাদী শাসন কায়েম করে। একদিকে এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, অন্যদিকে স্বয়ং মুসলিম সমাজের ইসলামী জীবনাচরণে দীর্ঘকাল যাবৎ বিপুল অনৈসলামিক আক্বীদা-বিশ্বাসের শক্ত অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই এ অঞ্চলে এক সর্বব্যাপী সংস্কারমূলক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল। সেই অনাগত বিপ্লবের হাতছানিই যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে সাইয়েদ আহমাদ শহীদের 'তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া' আন্দোলনের হাত ধরে উপমহাদেশের শিরক-বিদ'আতী জঞ্জালের অন্ধকার গহ্বরে তাওহীদী নবপ্রভাতের সূচনা ঘটায়। এই আন্দোলনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে ঘটে যায় বালাকোট যুদ্ধের মর্মান্তিক বিপর্যয়। ১৮৩১ সালের ৬ মে সংঘটিত ঐতিহাসিক এই বালাকোট যুদ্ধ একদিকে যেমন ছিল এই সংস্কারবাদী আন্দোলনের জন্য চরম বিপর্যয়ের, অপরদিকে বিদেশী বেনিয়াদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য উপমহাদেশের বুকে পরিচালিত সর্বপ্রথম সুসংঘবদ্ধ রণডঙ্কা। নিম্নে এ যুদ্ধের মহানায়ক সাইয়েদ আহমাদ শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বালাকোট যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপ্রবাহ উল্লিখিত হল।

সাইয়েদ আহমাদ শহীদ পরিচিতি :

সাইয়েদ আহমাদ শহীদ জন্মগ্রহণ করেন ২৯ই নভেম্বর ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের অযোধ্যা যেলায় একটি সুপ্রসিদ্ধ বংশে। তার বংশতালিকা চতুর্থ খলীফা আলী (আঃ)-এর সাথে মিলিত হয়েছে। বংশীয় রীতি অনুযায়ী চার বৎসর বয়সেই তাকে মক্তবে পাঠানো হয়। কিন্তু বাল্যকাল হতেই তাঁর মধ্যে শিক্ষার চাইতে খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ অত্যধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। তাঁর নিকটে কপাটি তথা সৈনিকদের বীরত্বমূলক খেলা ছিল খুবই প্রিয়। তাঁর খেলাধূলার মধ্যে ব্যায়াম ও শরীরচর্চার বিষয়টি মুখ্য ছিল। সাইয়েদ সাহেবের ভাগিনা নওয়াব ওয়াযীরুদ্দৌলার সেনাপতি সাইয়েদ আব্দুর রহমান বলেন, সূর্যোদয়ের পর এক ঘণ্টা পর্যন্ত সাইয়েদ সাহেব ব্যায়াম-কুস্তিতে কাটাতেন। ফলে তিনি অত্যধিক শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। সাইয়েদ সাহেবের জীবনের প্রারম্ভ থেকেই যুদ্ধের প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্র দ্বীনের স্বার্থে যুদ্ধ করার প্রবল মানসিকতা তখন থেকেই তাঁর মাঝে বিরাজ করছিল। একদা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। সাইয়েদ সাহেব তাতে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করলে তাঁর ধাত্রী মাতা তাঁকে কোন মতেই যেতে দিলেন না। আর তাঁর মা তখন ছালাতরত ছিলেন। সাইয়েদ সাহেব মাতার সালাম ফেরানোর অপেক্ষায় ছিলেন। মা সালাম ফিরিয়ে ধাত্রীকে বললেন, শোনো বিবি, আহমাদকে তুমি অবশ্যই স্নেহ কর, কিন্তু তা কখনো আমার স্নেহের সমান হতে পারে না। এটা বাঁধা দেয়ার সময় নয়। যাও বৎস, আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে এগিয়ে যাও। কিন্তু সাবধান পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর না। অন্যথায় তোমার চেহারা দেখব না। যদি শত্রুরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা ধরে তাহলে তাদের রাস্তা ছেড়ে দিও। সাইয়েদ সাহেব যখন সংঘর্ষস্থলে গিয়ে পৌঁছলেন তখন শত্রুরা বলতে লাগল, আমাদের রাস্তা ছেড়ে দিন আমরা চলে যাব। আপনাদের সাথে কোনো বিবাদ নেই। তখনই তিনি সাথীদের বললেন, এদের যেতে দাও কোন প্রকার বাধা দিও না।

সাইয়েদ আহমাদ শহীদ যৌবনে পদার্পণ করতেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। সংসারের দাবী ছিল যেন তিনি জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করেন। সঙ্গত কারণে কয়েকজন বন্ধুর সাথে তিনি রায়বেরেলী হতে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে অন্য বন্ধুরা চাকুরী খুঁজলেও তিনি তা থেকে বিরত থাকেন। আসলে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য উদগ্র বাসনা তাঁর চোখের তারায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেজন্য তিনি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করতে মনস্থ করেন। কেননা তৎকালীন উপমহাদেশের খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ হিসেবে খ্যাত শাহ আব্দুল আযীয দিল্লীতে বসবাস করতেন। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ও বন্ধুর পথ উপেক্ষা করে তিনি সেখানে পৌঁছেন। কেননা তিনি যখন দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন তখন তাঁর পরনের কাপড় ব্যতীত অন্য কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। দিল্লী পৌঁছে শাহ আব্দুল আযীযের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। তিনি তাঁর নিকটে অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয় দীক্ষা নেন ও তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি নতুনভাবে জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেন। এ সময় তাঁর জীবনে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। কিছুদিন পড়াশোনার পর হঠাৎ করে একদা তিনি লক্ষ্য করলেন, তাঁর দৃষ্টি থেকে অক্ষরগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তিনি এটাকে চক্ষুরোগ মনে

করে ডাক্তারের শরণাপন্ন হন, কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। ঘটনাটি শাহ আব্দুল আযীয জানতে পেরে তাঁকে পড়ালেখা ছেড়ে দিতে বলেন। এরপর তাঁর লেখাপড়ার চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। তাকওয়া ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে আরো কিছু সময় দিল্লীতে অবস্থান করে তিনি নিজ জন্মভূমি রায়বেরেলীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং একাধারে কয়েক বছর বাড়ীতে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি স্বীয় বংশীয় সাইয়েদ মুহাম্মাদ রওশন সাহেবের বিদূষী কন্যা বিবি জোহরার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর তিনি দ্বিতীয়বার দিল্লী ভ্রমণ করেন এবং নওয়াব আমীর খান (পরবর্তীতে যিনি বিশ্বাঘাতক হিসাবে প্রতিভাত হন)-এর সাহচর্য লাভ করেন। সেখানে তিনি তাঁর সৈন্যদলে যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, নওয়াব আমীর খানের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ হতে ইংরেজদের বিতাড়ন করা। আর এই লক্ষ্যকে স্বাগত জানিয়ে সাইয়েদ আহমাদ তাঁর সৈন্যদলে যোগদান করেন। কিন্তু যখন নওয়াব আমীর সাহেব লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ইংরেজদের সাথে আপোষকামিতার মত কাপুরুষোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন সাইয়েদ আহমাদ তার সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং সন্ধির বিরোধিতা করে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। দিল্লী পৌঁছে শাহ আব্দুল আযীযের স্বপ্ন অনুযায়ী তিনি দিল্লীর আকবরাবাদী মসজিদে অবস্থান করতে থাকেন, তখন লোকেরা চতুর্দিক থেকে তাঁর কাছে আসতে থাকে। আসলে শাহ আব্দুল আযীযের স্বপ্ন ছিল সমগ্র মুসলিম ভারতবাসীকে ছিরাতে মুস্তাকীমের উপর পরিচালিত করা। আর সেই কাজটির দায়িত্ব অর্পিত হয় সাইয়েদ আহমাদের উপর। সুতরাং দলে দলে মানুষেরা তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করতে থাকে। এমনকি ভারতের বিখ্যাত আলিম-ওলামাও তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ থেকে বাদ যাননি। শাহ ইসমাঈল শহীদ ও মাওলানা আব্দুল হাই প্রমুখ বিখ্যাত আলিম তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন স্থান হতে দাওয়াতপত্র আসতে থাকে, যার প্রেক্ষিতে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে বায়আত গ্রহণ করতে থাকেন ও দ্বীনী দীক্ষা দিতে থাকেন। মুসলমান ছাড়া হিন্দুরাও সাইয়েদ সাহেবের প্রতি সুধারণা পোষণ করত। এমনকি তারা তাঁকে দাওয়াত দিয়েও আপ্যায়ন করত। একদা তহসিলদার ধকল সিং তাঁকে দাওয়াত দেয় এবং দুইশত কর্মচারীসহ নিজে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে দুপুর ও রাত্রিতে আপ্যায়ন করায়। ধকল সিং-এর অধিকাংশ কর্মচারী ছিল মুসলমান। সেখানে তাঁর সকল মুসলমান কর্মচারীরা সাইয়েদ সাহেবের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।

নাসিরাবাদে শীআ এবং সুন্নীদের মাঝে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা হাঙ্গামার পুনরাবৃত্তির সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিলে সুন্নী নাসিরাবাদীরা সাইয়েদ সাহেবকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করলে তিনি তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রায় ৭০/৭৫ জন সঙ্গী নিয়ে তথায় উপস্থিত হন। এ অভিযানে শাহ ইসমাঈলের মাতা ২৫ টাকা হাদিয়া দেন। নাসিরাবাদে পৌঁছে শীআ নেতাদের নিকটে খবর পাঠান যে, তোমাদের কোন লোকজন যেন আমাদের কোন লোকের সাথে ঝগড়া করতে না আসে। আর নিজের লোকজনকেও সতর্ক করে দিলেন যাতে তারা তাদের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়। পরে বিষয়টি শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হয়। নাসিরাবাদে চেহলাম উপলক্ষে পুনরায় বিবাদ হওয়ার সমূহ সম্ভবনা দেখা দিলে সাইয়েদ সাহেবকে পুনরায় খবর দেওয়া হয় এবং তিনি সেখানে সদলবলে উপস্থিত হন। পরে নবাব মুতাসিমুদ্দৌলা, যিনি সরকারীভাবে ৫০০ অশ্বারোহীসহ পদাধিক বাহিনী নিয়ে এসেছিলেন, তিনিসহ একশজন সৈন্য তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। এ সময় লোকেরা সাইয়েদ সাহেবের দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, দৃঢ়তা, সংযম এবং সামরিক শৃঙ্খলা ও দক্ষতার স্পষ্ট নমুনা দেখতে পায়। নাসিরাবাদে পৌঁছে তিনি শহরে আত্মরক্ষাব্যূহ রচনা করেন এবং শহরে সামরিক নিয়ম-শৃঙ্খলা কায়েম করেন। যা কেবলমাত্র একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ সামরিক কর্মকর্তাই করতে পারে।

ইতিমধ্যে সাইয়েদ সাহেব হজ্জ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর বংশের লোকজনসহ ভক্তদেরকে হজ্জের সাথী হওয়ার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতে থাকলেন। সারা ভারত থেকে পাথেয়সামগ্রী এবং সঙ্গী সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ভারতের উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ সফর করেন। ১২৩৬ হিজরীর শাওয়াল মাসের শেষদিন সোমবার ৪০০ লোক সঙ্গে নিয়ে সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী (রহঃ) স্বীয় বাসভবন থেকে রওয়ানা হন এবং তাঁর লোকসংখ্যা পালকী বাহক ৮০ জন বেয়ারা বাদ দিয়ে সর্বমোট ৪০৭ জন ছিল। উক্ত হজ্জ কাফেলার সাথে মহিলাগণও ছিলেন। ৩ যিলকাদ বৃহস্পতিবার মাল-সামান ও আসবাব-পত্র জাহাজে তোলা হল। শুক্রবার সকালে সাইয়িদ সাহেব কাফেলার সব লোকদেরকে একত্রিত করে এক এক দল লোকের জন্য একজন করে আমীর, একজন দায়িত্বশীল ও একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করলেন এবং পুরো সফরের জন্য দলের নেতৃত্ব ও শৃংখলা বিধান করলেন।

হজ্জে যাত্রার পথে তিনি বিভিন্ন স্থানে নোঙ্গর করে হাজার হাজার মানুষের বায়আত গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে ওয়ায-নছীহত করেন। আর অসংখ্য মানুষের দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং তাদের নযরানা গ্রহণ করেন। অবশেষে কলকাতা থেকে মক্কা মুয়ায্যামা অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর এ অভিযানে বেশ কয়েকটি জাহাজ ছিল। কাফেলায় সর্বমোট যাত্রী ছিল ছয়শত তিরানব্বই জন। কলকাতা থেকে জাহাজ বন্দর নগরী আলপ্পী ও কালিকট অতঃপর তথা হতে আদন, অতঃপর ইয়ালামলাম পৌঁছে সেখান হতে জেদ্দায় পৌঁছায়। পথিমধ্যে সাইয়েদ সাহেব হুদায়বিয়ায় যাত্রা বিরতি দিয়ে দোআ করেন ও সাথীদের নিকট হতে জিহাদের বায়'আত নেন। ২৯ শা'বান ১২৩৭ হিঃ মক্কা মুয়ায্যামায় পৌছান। ওমরা ও হজ্জ আদায়ের পর তিনি তাঁর সফরসঙ্গীদের বিরাট দল নিয়ে মক্কা মুআয্যামায় দীর্ঘ দিন অবস্থান করেন এবং ওয়ায-নছীহত এবং দ্বীনী তা'লীম-এর মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করেন। অবশেষে ১২৩৮ হিঃ ১৫ শাওয়াল মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন করেন ও পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে ভারতে ফিরে আসেন। ১২৩৮ হিজরী রামাযান থেকে ১২৪১ হিজরীর ৭ জমাদিউস ছানী পর্যন্ত পূর্ণ এক বৎসরকাল রায়বেরেলীতে অবস্থান করে নিজ বাড়ী-ঘর ও বেশ কিছু মসজিদ নির্মাণ করেন এবং জিহাদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

সাইয়েদ আহমাদ সাহেব তৎকালীন সময়ে ভারতের অভ্যন্তরে তাঁর যুদ্ধ পরিচালনার কেন্দ্র স্থাপন করেননি, এটা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতারই পরিচায়ক। বরং তিনি তাঁর জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রচারসহ বিভিন্ন স্থানে সফর করে এবং যুদ্ধকেন্দ্র হিসাবে আফগানিস্তানকে মনোনীত করে অবশেষে তথায় পৌঁছে যান। কান্দাহার, কাবুল অতিক্রম করে খেশগীতে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮২৬ নওশহরে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি অত্যাচারী শিখ রাজা বুখ্য সিং-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রথমে কর বা জিজিয়া প্রদানের প্রস্তাব দেন। এরপরই একজন সংবাদবাহক এসে খবর দেয় যে, বুখ্য সিং সৈন্য নিয়ে আকুড়ায় প্রবেশ করেছে। একথা শুনে সকলকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। মুসলিম বাহিনীর নৈশকালীন অতর্কিত হামলায় সাতশত শিখ সেনা

নিহত হয় এবং মুসলমানদের পক্ষে ৩৬ জন ভারতীয় ও ৪৫ জন কান্দাহারী মুজাহিদ নিহত হন এবং আরও ৩০/৪০ জন আহত হন। এই যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়েই মুসলমানদের সাহস, আগ্রহ-উদ্দীপনা শতগুণে বেড়ে যায়। যার পরিণতিতে বালাকোট যুদ্ধের সূচনা হয়।

বালাকোট পরিচিতি :

বালাকোট শহর পাকিস্থানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খাইবার-পাতুনওয়ার হাযারা প্রদেশে অবস্থিত মেনসেরা যেলা থেকে ৩৮ কি: মি: পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত। চারিদিকে টিলাঘেরা দূর্গম এই ঐতিহাসিক শহরটি আকর্ষণীয় পর্যটনস্থল হিসাবে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। শহরটি কাগান উপত্যকার প্রবেশমুখ।

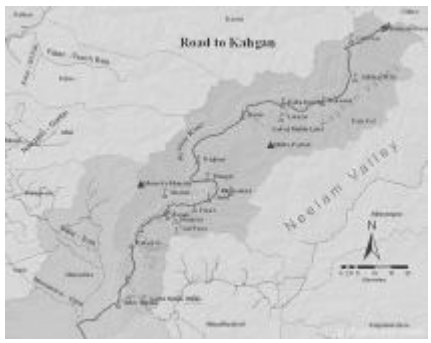

লুলুসার লেক থেকে উৎসারিত কুনহার নদী এই শহরের পাশ দিয়ে

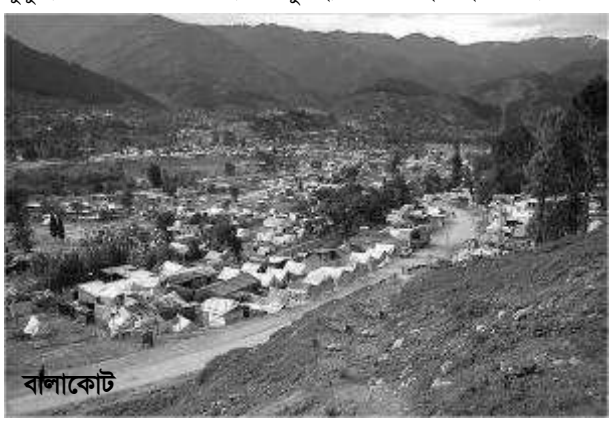
বালাকোট

বয়ে পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীরে ঝিলাম নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। জনৈক বালাপীরের নামানুসারে এই অঞ্চলের নামকরণ করা হয় বলে জানা যায়। প্রাচীন বালাকোটে যেখানে ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তা ছিল পার্শ্ববর্তী মেটিকোট টিলা ও ঝরণা এলাকায়।

কুনহার নদী

উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের ৮ই অক্টোবর এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে শহরটি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরবর্তীতে সঊদী আরব, আরব আমিরাত ও পাকিস্তান সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় শহরটি আবার গড়ে তোলা হচ্ছে।

বালাকোট যুদ্ধের পটভূমি :

তৎকালীন পেশোয়ারের সুলতান মুহাম্মাদ খাতেনের ষড়যন্ত্রে ইসলামী হুকুমতের ক্বাযী, তহসিলদারসহ বহু কর্মচারীর গণহত্যার ঘটনায় সাইয়েদ আহমাদ অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং তিনি দ্বিতীয় দফা হিজরত করার মানসে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহঃ) যে পাঞ্জতার নামক স্থানে অবস্থানরত মুজাহিদ গোত্র ত্যাগ করেন এবং হাযারা জেলার উচ্চভূমির দিকে গমন করেন, তার উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানে কেন্দ্র স্থাপন করে উপমহাদেশকে বিধর্মী ও বিদেশীদের জবর দখল হতে মুক্ত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হবার প্রস্তুতি গ্রহণে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান ছিল এই বালাকোট, সেকারণ এখানেই সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। অবশ্য প্রথম দিকে প্রধান সামরিক ঘাঁটি রাওয়ালপিণ্ডিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী তাঁর দীর্ঘ চার বছরের পাঞ্জতার ঘাঁটি ছেড়ে কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময়টি ছিল ডিসেম্বরের বরফঢাকা শীতকাল। সাইয়িদ আহমাদ কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে যে এলাকাটি ত্যাগ করেছিলেন শিখরা শীঘ্রই সে এলাকাটি দখল করে তথাকার জনগণের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন করল। এ সময় কাশ্মীর গমনের পথে বিভিন্ন এলাকার খান ও সামন্তগণ যেমন- মুজাফ্ফরাবাদের শাসনকর্তা যবরদস্ত খান, খুড়া অঞ্চলের সামন্ত নাজা খান, দেরাবা অঞ্চলের সামন্ত মানসুর খান ও গাঢ়ী অঞ্চলের সামন্ত হাবীবুল্লাহ খান প্রমুখ সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সাইয়েদ আহমাদ এই আবেদনে সাড়া দিয়ে যবরদস্ত খানের সাহায্যার্থে মৌলবী খায়রুদ্দীন শেরকুটীর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ মুযাফ্ফরবাদে প্রেরণ করলেন। এদিকে শিখ সেনাপতি রনজিৎ সিংহ-এর পুত্র শেরসিংহ বিরাট বাহিনী নিয়ে নখলী নামক স্থানে পৌঁছে যায়। ফলে সাইয়েদ আহমাদ উক্ত বাহিনী কোন দিকে অগ্রসর হয় তার গতিপথ নির্ণয় করে পরবর্তী করণীয় স্থির করাকে সমীচীন মনে করলেন। এ সময় তিনি মূল গন্তব্য কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হওয়ার নিমিত্তে শের সিং-এর বাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে এগিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেননি। কারণ হাযারাবেলাতে অবস্থানকারী সাইয়েদ আহমাদ-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পৃক্ত খানদের শিখ সেনারা অত্যাচারের শিকার বানাত। তাই তিনি তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত হাযারাতেই থেকে গেলেন। পরে যখন তিনি শুনতে পেলেন যে, শের সিংহ ভূগাড়মুঙ্গ গিরিপথ আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে, তখন তিনি নিজে রাজদারওয়ান নামক স্থান হতে সারচুল নামক স্থানে পৌঁছান এবং শাহ ইসমাঈল শহীদকে বালাকোট পাঠিয়ে দিলেন। তারপর যখন তিনি জানলেন যে, শের সিং বালাকোট আক্রমণ করতে পারে তখন তিনি ভুগাড়মুঙ্গের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নিজেই বালাকোটে চলে গেলেন। আর সেই সময় শের সিং-এর বাহিনী কুনহার নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত সোহাল নাজাফ খান গ্রামের সম্মুখে ময়দান নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে।

ঘটনাপ্রবাহ :

একটি বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়া আবশ্যক যে, শিখ বাহিনীর অবস্থান থেকে বালাকোটে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করার দু'টি পথ ছিল। প্রথমত : কুনহার নদীর পূর্ব তীর বরাবর উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়ার পর নদী পার হয়ে বালাকোটে পৌঁছনো। দ্বিতীয়ত : ভুগাড়মুঙ্গের গিরিপথের মধ্য দিয়ে বালাকোটে পৌঁছনো। মূলত

বালাকোটে পৌঁছনোর জন্য তাদের সোজা কোন পথ ছিল না। কেননা বালাকোটের পূর্ব দিকে কালুখানের উচ্চচূড়া পশ্চিম দিকে মেটিকোট পর্বত শিখর ও উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত কুনহার নদী। বালাকোট মূলত দক্ষিণমুখী একটি উপত্যকার নাম। কুনহার নদীর উৎসমুখ ছাড়া এখানে প্রবেশের কোন পথ নেই। সঙ্গত কারণেই অনেক কষ্টে মুজাহিদ বাহিনীসহ সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী ১৮৩১ সালে ১৭ এপ্রিল বালাকোটে প্রবেশ করেন। উপমহাদেশের জিহাদ আন্দোলনের পথিকৃৎ, সমরকুশলী, আল্লাহ্র পথের নিবেদিতপ্রাণ বীর সিপাহসালার সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী তাঁর সূক্ষ্ম পরিকল্পনা মাফিক বালাকোটে প্রবেশ করা যায় এমন ধরনের কয়েকটি স্থানে প্রতিরক্ষামূলক সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছিলেন। বলা যায়, রাসূল (ছাঃ) উহুদ যুদ্ধের সময় গিরিপথ বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে স্বশস্ত্র সৈন্য মোতায়েন করেন সে পদ্ধতিকেই তিনি অনুসরণ করেছিলেন। কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ায় পর শিখ শিবিরে অগ্রযাত্রার লক্ষণ আঁচ করা গেল। শিখ সৈন্যরা পারাপারের সুবিধার জন্য আগেই নদীর উপর একটি কাঠের সাঁকো নির্মাণ করে রেখেছিল। সেই সাঁকোর উপর দিয়ে নদী পার হয়ে শিখ সৈন্যরা সোহাল নাজাফ খান গ্রামের দক্ষিণ দিক দিয়ে এবং সোহাল গ্রামের পার্বত্যাঞ্চলের পাদদেশে দিয়ে সাইয়েদ

২০০৫ সালে ভূমিকম্পের পর বালাকোট শহর

আহমাদের মুজাহিদ বাহিনী ঢাকা গ্রামের পশ্চাতে পৌঁছান। আর সেই দিকেই বালাকোটের দক্ষিণাংশে খাড়েয়্যানের কাছে এবং পূর্ব দিকে সাঁকোর কাছে তিনি সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছিলেন। এইভাবে মেটিকোটে ও উহার পাহাড়ী রাস্তায় একেকটি করে সামরিক চৌকি বসিয়ে রেখেছিলেন। আর সর্বাগ্রের চৌকির নেতা ছিলেন মীর্যা আহমাদ বেগ খান। অকস্মাৎ তার চৌকির দিক হতে গুলির শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই জানা গেল যে, শিখ সৈন্যগণ এদিক দিয়েই বালাকোটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মীর্যা আহমাদ বেগ ও তাঁর নেতৃত্বাধীন মুজাহিদ বাহিনী বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শিখ বাহিনীকে প্রতিরোধ ও গতিরোধ করার চেষ্টা চালালে তাদের একাংশ শাহাদত বরণ করেন এবং বাকী অংশ পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হন।

তারপর মেটিকোটে স্থাপিত চৌকিরত মুজাহিদদেরকে তাদের পথ দিয়ে শিখ বাহিনীর প্রবেশ করার বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হল। এমনকি বালাকোটেও পৌঁছিয়ে দেওয়া হল। তবে শিখ সেনাদের গতিরোধ করা কোনমতেই সম্ভব হল না। বিপুল সংখ্যক সৈন্য মেটিকোটে পৌঁছে গেল। আর মেটিকোট মূলত একটি পাহাড়, যার পাদদেশের সমতল ভূমিই হচ্ছে বালাকোট। বালাকোট অঞ্চলের একটি প্রবাদ আছে যে, মেটিকোট যার অধিকারে আসবে, বালাকোট তারই অধিকারে আসবে'। সুতরাং যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের বিষয়টি আগেই নির্ধারণ হয়ে গেল। ফলে মুজাহিদদের সংখ্যাল্পতা ও রসদ-সমরাস্ত্রে অপ্রতুলতা সত্ত্বেও সাইয়েদ আহমাদের জন্য বালাকোটের পশ্চিমাংশের অবস্থিত প্রান্তরে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর রইল না। এখানে একটি কথা বলে নেওয়া ভাল যে, এমত পরিস্থিতিতে যদি সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী আপাতত যুদ্ধ এড়াবার জন্য পিছন দিকে চলে যেতেন তাহলে শিখ সৈন্যগণ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে পারত না। অথবা তিনি নদী পার হয়ে পূর্ব তীরে পৌঁছেও আক্রমণ করতে পারতেন। আর এ ব্যাপারে যেসব মুসলিম গ্রামবাসী অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাপে পড়ে শিখদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন তারাও গোপনে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু ইতিহাস যে সাক্ষ্যটি এ যাবৎ বহন করে চলছে তা যে আরশে আযীমের অধিপতির পক্ষ হতে বহুকাল পূর্বেই নির্ণিত হয়ে রয়েছে। সুতরাং সর্বদিক ভেবে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কোনরূপ রণকৌশল নয়; বরং বীরত্ব, সাহসিকতা ও ঈমানী শক্তির যে মূল্যবান সম্পদ মুজাহিদগণের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাকে সম্বল করেই শিখদের বিপুল সমরশক্তির মুকাবিলা করে যাওয়াকে এবং তার পরিণতিকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়াকেই স্বীয় কর্তব্য বলে গ্রহণ করলেন।

৫ই মে শিখ সৈন্যগণ মেটিকোট পাহাড়ের শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হয়েছিল। বিধায় ৬ই মে ১৮৩১ মোতাবেক ২৪ যুলকা'দা ১২৪৬ হিঃ সনে পবিত্র জুম'আর দিনে সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভীর মুজাহিদ বাহিনী চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেন। উল্লেখ্য যে, মুজাহিদ বাহিনীতে সর্বমোট যোদ্ধা ছিল ৭০০ জন এবং শিখ সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। শিখ সৈন্যগণ মেটিকোট টিলা হতে বালাকোট ময়দানে অবতরণ করতে আরম্ভ করল। আর সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী এবং অধিকাংশ মুজাহিদ মসজিদে-ই বালা ও তার আশপাশে অবস্থান করছিলেন। উল্লেখ্য যে, ৭০০ জনের মুজাহিদ বাহিনীকে সাতবানে ঝরনা বরাবর বহুদূর পর্যন্ত শিবির স্থাপন করানো হয়েছিল। সায়্যিদ আহমাদ ব্রেলভী হঠাৎ শিখদের আক্রমণ করার জন্য মসজিদ-ই বালা হতে বের হয়ে মসজিদে যেরিনে পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে মেটিকোটের পাদদেশের দিকে অগ্রসর হলেন। মেটিকোটের পাদদেশে অবতরণরত শিখসেনাদের অধিকাংশ নিহত হল। কিন্তু ইতিমধ্যে মেটিকোটে টিলার প্রতিটি ইঞ্চি পর্যন্ত সৈন্য দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল। তারা প্রত্যেক স্থান দিয়ে নেমে এসে মুজাহিদদের উপর প্রচণ্ড হামলা শুরু করে। সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী মুজাহিদ বাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন। তার সাথে ছিলেন একান্ত সহযোগী শাহ ইসমাঈল। হঠাৎ করে সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী মেটিকোটের ঝরনার মধ্যে শাহাদত বরণ করেন এবং শাহ ইসমাঈলও শাহাদত বরণ করলেন। মুজাহিদগণের একটি বড় দল সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভীর শাহাদত বরণের বিষয়টি উপলব্ধি করতে না পারায় তাঁর সন্ধানে ঘুরে ঘুরে শাহাদত বরণ করলেন। এছাড়া মুজাহিদদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল কমপক্ষে দুই ঘণ্টা। অতঃপর গোজার গোষ্ঠির লোকজন বিভিন্ন দলে উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করতে থাকল যে, সাইয়েদ আহমাদকে পাহাড়ের উপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা সকলে পাহাড়ের উপরের দিকে আস। ফলে মুজাহিদগণ উত্তর দিকে অবস্থিত পাহাড়ের দিকে গমন করেন। আর এইভাবে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। গোজার গোষ্ঠির লোকদের এরূপ করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হয় তারা শিখদের প্ররোচনায় তা করেছিল। কেননা মুজাহিদগণ মেটিকোটে যুদ্ধরত থাকলে আরও বহু শিখ যোদ্ধার প্রাণনাশ হত। অথবা অবশিষ্ট মুজাহিদগণকে হিজরতের উদ্দেশ্যে উক্ত কৌশল

অবলম্বন করতে হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। মুজাহিদ বাহিনীর আমীর ও প্রধান সেনাপতি সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভীর শহীদ হওয়া সম্পর্কে অন্য একটি কথা ছড়িয়ে আছে তা হল তিনি মুজাহিদগণের অগ্রভাগে ছিলেন এবং শিখদের একদল সৈন্যের মধ্যে ঢুকে পড়েন। শিখরা তাঁকে ঘেরাও করে ফেলে যা তাঁর অনুসারীরা লক্ষ্য করেননি। এভাবে তিনি শহীদ হন এবং তাঁর লাশও মুজাহিদগণ শনাক্ত করতে পারেননি। এ কারণে অনেককাল পরেও অবশিষ্ট মুজাহিদগণ সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভীর শাহাদতের বিষয়টি সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারেননি।

একটি বর্ণনা মতে, একজন বন্দী প্রত্যক্ষ করেন যে, তাঁর খণ্ডিত দেহ পাওয়া গিয়েছিল এবং এক নদীর ধারে তাকে কবরস্থ করা হয়েছিল। অনেকেই সেটাকে তাঁর কবর বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু অপর একটি বর্ণনা মতে, তাঁর মস্তক নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং তা কয়েক মাইল ভাটিতে পাওয়া গিয়েছিল। অতঃপর সেটি সেখানে কবরস্থ করা হয়।

ওদিকে মুজাহিদগণের মধ্য থেকে প্রায় ৩০০ জন শাহাদাত বরণ করেন। আর ৭০০ জন শিখ সৈন্য নিহত হয়। ১০০০ জন শিখ সেনা নিহত হবার কথাও কোন কোন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। আর অন্য বর্ণনা মতে, ৬০০ মুজাহিদ শহীদ হন। তবে নির্ভরযোগ্য তথ্য হল, সেখানে ৩০০ মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন আর শিখ সৈন্য নিহত হয় ৭০০ জন।

এরপর শিখদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বালাকোটের ঘর-বাড়ীতে আগুন দিয়ে তাদের নিহত সৈন্যদের লাশ তার মধ্যে নিক্ষেপ পূর্বক পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। শিখদের উক্ত আগুন লাগানোর ফলে মুসলমানদের অপরিমেয় ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। ভস্মীভূত সম্পদের মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য যা ছিল তা হল সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাইল শহীদের অনেক রচনা, পত্রাবলীর পাণ্ডুলিপি, পুস্তিকা ও বক্তৃতাবলীর অনুলিপি। সমসাময়িক যুগের অনেক আলিম, সুলতান ও বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তির পত্রাবলীও সেখানে ছিল। এছাড়া সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভীর সম্পূর্ণ দফতরই বালাকোটে অবস্থিত ছিল। যেখানে রোজনামচাসহ তাঁর জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনায় রচিত 'নূর-ই আহমদী' গ্রন্থটিও সংরক্ষিত ছিল।

ঘটনা প্রবাহের শেষ লগ্নে অবশিষ্ট মুজাহিদগণ পালিয়ে উপত্যকার বিপরীতে রাত্রি যাপন করেন। ধীরে ধীরে তারা সেখানে একত্রিত হন এবং আংগ্রাইতে রাত্রিযাপন করেন। দু'জন গুপ্তচর এসে জানালেন যে, সাইয়েদ জীবিত এবং নিরাপদে আছেন। কিছু দূরে তিনি আছেন। মুজাহিদরা পরবর্তী প্রভাত পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করলেন। সূর্যোদয়ের পর যখন তাঁরা গোজারদের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলেন তখন সাইয়েদের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন না। মুজাহিদরা যখন তাঁদের নেতাকে নিজেদের মধ্যে অবর্তমান দেখলেন তখন তারা শোকাহত হলেও ভেঙ্গে পড়লেন না। আন্দোলনের লক্ষ্য পরিত্যাগের ধারণা তাঁরা তাদের হৃদয়ে স্থান দেননি। এজন্যে তারা সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভীর প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত অথবা তারা মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চয়তা লাভ না করা পর্যন্ত দায়িত্বভার আরোপের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন নেতা হিসাবে কুলাতের শাইখ ওয়াদী মুহাম্মাদকে নেতা নির্বাচিত করলেন। এভাবে আন্দোলন অব্যাহত থাকলেও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনটি অচিরেই স্তিমিত হয়ে পড়ে।

পরাজয়ের কারণ :

মুজাহিদদের সংখ্যাস্তা ও রসদপত্রের অপ্রতুলতা যুদ্ধে পরাজয়ের অন্যতম কারণ হিসাবে ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করলেও পরাজয়ের মূল কারণ ছিল মুসলিম নামধারী মুনাফিকদের বিশ্বাসঘাতকতা। তা ছিল- প্রথমত: যেসব সামন্ত ও খানরা শিখবাহিনীর হাত থেকে তাদেরকে রক্ষার জন্য সাইয়েদ আহমাদকে আহ্বান করেছিল তারা পরবর্তীতে মুসলমানদের সাহায্য না করে গোপনে শিখদের সাথে হাত মিলায়। দ্বিতীয়ত: শিখবাহিনী যখন মেটিকোটে আরোহনের চেষ্টা করছিল তখন সেখানে পাহারায় থাকা মুজাহিদ বাহিনীতে অনুপ্রবেশকারী কিছু মুনাফিক তাদেরকে গোপন পথ বাতলে দেয়। এই চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা না করলে শিখবাহিনী মেটিকোটে প্রবেশ করতে পারত না। তৃতীয়ত: সাইয়েদ আহমাদের সাথে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে হাযারার এক উপজাতীয় প্রধান শিখদেরকে বালাকোটের সাথে সংযুক্ত পাহাড়ের উপরিভাগে উঠার গোপন পথের সন্ধান দিয়ে। এভাবেই ক্ষুদ্র অথচ পর্বতসম ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান মুজাহিদ বাহিনীর চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণান্তে বলা যায় যে, যুলুম-নির্যাতন ও পরাধীনতার শিকল ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জন ও আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস ওহীর বিধান তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার-প্রসার এবং অপসংস্কৃতির পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে পরিচালিত প্রথম সংঘবদ্ধ প্রয়াস হল 'জিহাদ আন্দোলন'। যা সম্ভব হয়েছিল সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর মত একজন সিংহকেশর, দৃঢ়চিত্ত বিপ্লবী পুরুষ এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন একদল বিশুদ্ধ আত্মার নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনীর মাধ্যমে। মুজাহিদ নামধারী কিছু মুনাফিক পাহারাদার এবং কিছু মুসলিম জমিদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা না করলে উপমহাদেশের প্রথম এই জিহাদ আন্দোলন শিখদের দমন ও ব্রিটিশদের বিতাড়নে এত তাড়াতাড়ি ব্যর্থ হত না। তারপরও এটা সুনিশ্চিত যে, বালাকোট যুদ্ধের সূত্র ধরেই উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। তাইতো পরবর্তী যুগ পরিক্রমায় ভাবী পুরুষদের মাধ্যমে এ আন্দোলনের স্মৃতি বার বার মাথাচাড়া দিয়েছে। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ বেনিয়া বিরোধী দুঃসাহসী সিপাহী বিদ্রোহ তথা অসহযোগ আন্দোলনসহ উপমহাদেশের পরবর্তী সকল সংস্কারবাদী ও স্বাধীনতাকামী আন্দোলন আমাদের তা-ই স্মরণ করিয়ে দেয়। সত্যি বলতে কি উপমহাদেশের পরবর্তী সকল ইসলামী আন্দোলনগুলোই মূলত এ আন্দোলনেরই পরোক্ষ ফসল। যতদিন এ উপমহাদেশ থেকে শিরক-বিদ'আতের শিখণ্ডিগুলোর মূলোৎপাটন না ঘটবে, যতদিন দ্বীনে ইসলামের শ্বেত-শুভ্র পত্র-পল্লব বাহিত পবিত্র বাতাস এ যমীনের বুকে অপ্রতিহতভাবে প্রবাহমান না হবে, ততদিন পর্যন্ত ইতিহাসের পাদপীঠে ক্ষুদ্র তিলকের মত এ সবিশেষ এই ক্ষণটুকুর মহিমা, এর অন্তস্থ বিপ্লবের অগ্নিশিখা ভাবী প্রজন্মের প্রতিটি মুসলিম মুজাহিদের অন্তরে ক্ষিপ্র প্রেরণাজ্বালা হয়ে জাগরুক থাকবে; প্রকাশ্যে ও সঙ্গোপনে।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. আবুল হাসান নাদভী, সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ।
২. ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (পিএইচ.ডি থিথিস)।
১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।
২. আই, এইচ কুরেশী, উপমহাদেশের রাজনীতিতে আলেম সমাজ; (ঢাকা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ : ২০০৫)।
৩. মুহাম্মাদ মিঞা, ওলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী।
৪. ড. মুহিব্বুল্যাহ সিদ্দীকী, প্রবন্ধ : বালাকোটের মর্মান্তিক শিক্ষা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন ২০০৭, পৃ: ৩৩।

অনুসরণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম

-ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ

নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছাড়া কোন কিছুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অকল্পনীয়। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম নেই। পানির ধর্ম নিচের দিকে প্রবাহিত হওয়া, ০°C তাপমাত্রায় বরফ এবং ১০০°C বা তার চেয়ে অধিক তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হওয়া। তাছাড়া পানিতে নিমজ্জিত কোন বস্তু কর্তৃক অপসারিত পানির ওজন অপেক্ষা বস্তুর ওজন কম হলে তাকে ভাসিয়ে রাখা এবং বস্তুর ওজন বেশি হলে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া প্রভৃতি পানির সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম। অনুরূপ আগুনের ধর্ম হচ্ছে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় ঊর্ধ্বগামী হওয়া, তাতে নিপতিত যেকোন দাহ্য বস্তুকে জালিয়ে-পুড়িয়ে ছাইভস্ম বা নিঃশেষ করে দেওয়া ইত্যাদি। এমনিভাবে জীব-জড়, কঠিন, তরল, বায়বীয়সহ সকল পদার্থই তার আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্র পরিচয়ে বিরাজমান।

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এ পর্যন্ত ১১১টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। যাদের সুনিয়ন্ত্রিত সমন্বয়ে বিশ্বে কোটি কোটি পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে। সকল পদার্থই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের অধিকারী। পৃথিবীর সকল বস্তুই আপন আপন ধর্ম মেনে নিজ পরিচয়ে অস্তিত্বশীল হয়ে আছে। সমগ্র বিশ্বে এমন একটি বস্তুও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে নিজ ধর্ম বিরোধী আচরণ করে বা করতে চায়। সৃষ্টিকর্তা যাকে যেখানে যেরূপ ধর্মগুণে সৃষ্টি করেছেন, সে সেখানে ঠিক সেরূপ আচরণ করে থাকে। এমনকি একই নদীতে বিনা পর্দায় মিঠা ও নোনা পানির স্রোত আবহমানকাল ধরে যার যার মত বয়ে চলে, কেউ কারো সাথে মিশে যেতে চায় না বা যায় না। এমনিতর হাযারও প্রমাণ আছে যে, পৃথিবীর সকল বস্তুই আপন ধর্ম মেনে স্বকীয় অস্তিত্বে বিরাজমান। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে যখনি কোন বস্তুর মধ্যে আপন ধর্মের বিচ্যুতি ঘটে, তখনই উক্ত বস্তু তার স্বতন্ত্র পরিচয় হারিয়ে ফেলে হয় নতুন পরিচয়ে পরিচিত হয়, অন্যথা নিঃশেষ হয়ে যায়। যার একমাত্র কারণ ধর্ম বিচ্যুতি। সুতরাং একমাত্র ধর্ম ঠিক থাকলেই সকল বস্তু তার নিজ পরিচয়ে অস্তিত্ববান থাকতে পারে।

মানুষ ব্যতীত পৃথিবীর সকল সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তার নির্দেশমত পরিচালিত হয়। অন্যান্য সৃষ্টির চেয়ে মানুষকে আল্লাহ অতিরিক্ত কিছু যেমন বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, ভাল-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ করণেই মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। অন্যান্য সৃষ্টির মত মানুষকেও এই পৃথিবীতে চলার জন্য একটা ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন। সাথে সাথে স্বতন্ত্র ক্ষমতার কারণে তাকে দেওয়া হয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা। অর্থাৎ মানুষ আপন বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দিয়ে ভাল-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ করে পৃথিবীতে চলাফেরা করবে। এক্ষেত্রে যে ভাল পথে চলবে, সে কল্যাণ লাভ করবে; আর যে মন্দ পথে চলবে, সে অকল্যাণের অনুগামী হবে।

মানব জীবনে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। বর্তমান বিশ্বে ধর্ম নিয়ে নানারকম মন্তব্য, চিন্তাধারা ও গবেষণা শুরু হয়েছে। মুষ্টিমেয় কিছু নাস্তিক ছাড়া মানব জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। মানব জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে C. J. Ducasse তাঁর A Philosophical Scrutiny of Religion গ্রন্থে বলেন, 'ধর্ম-সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের সত্যতা বা মিথ্যাত্বের প্রশ্ন, কিংবা ধর্মের পরিণাম প্রায়শই। ভাল না মন্দ, এসব প্রশ্ন উত্থাপন না করেও বলা যেতে পারে যে, ধর্ম মানুষের জীবনের এক অসাধারণ আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিক'। Thompson তাঁর The Philosophy of Religion গ্রন্থে বলেন, 'So far as religion has truth accessible to human reason the philosophy of religion is an essential part of any comprehensive view.' অর্থাৎ ধর্মের যদি এমন সত্য থাকে যা মানুষের বিচারবুদ্ধির অধিগম্য, তাহলে ধর্মদর্শন যেকোন সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় অংশ। মোট কথা মানব জীবনে ধর্মের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা কোনভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

এখন প্রশ্ন হল ধর্ম কি? তত্ত্বগতভাবে বস্তুর অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রকৃতিই তার ধর্ম, যা তার অস্তিত্বকে ধারণ করে আছে। ধর্ম শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় ধৃ+মন্=ধর্ম। অর্থাৎ ধৃ ধাতু থেকে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। সুতরাং যা ধারণ করা হয় তাই ধর্ম।

আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী (ছাঃ) পর্যন্ত একলক্ষ চব্বিশ হাযার নবী-রাসূলের আনীত ধর্মের নাম 'ইসলাম'। ইসলাম স্বভাবধর্ম। মহান আল্লাহ বলেন, فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ 'এটাই আল্লাহ্র ফিতরাত, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সরল-সোজা মযবূত দ্বীন।'[১] এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অন্যান্য সৃষ্টির মত আল্লাহ মানুষকেও সুনির্দিষ্ট ফিতরাত বা স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন। কালের বিবর্তনে, পরিবেশ ও পরিস্থিতির শিকারে মানুষ সৃষ্টিগত স্বভাব ভুলে ভিন্ন স্বভাব বা ধর্মের অনুগামী হয়ে পড়ে। ফলে সমাজে নানা রকম বিপর্যয় নেমে আসে। মানুষকে স্বভাবধর্মের উপরে সৃষ্টির বিষয়ে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ– 'প্রত্যেক নবজাতকই ফিতরাতের (স্বভাবধর্মের) উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়'।[২] এ হাদীছে থেকেও বুঝা যায় যে, সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষই সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত স্বভাবধর্ম তথা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর সমাজ ও পিতা-মাতার ধর্ম তাকে জন্মগত স্বভাবের উপরে বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে আস্তে আস্তে তার ভিতর থেকে সৃষ্টিগত স্বভাবধর্ম নিঃশেষ হয়ে, অন্য ধর্ম আসন গেড়ে বসে।

যেকোন ব্যক্তি বা বস্তুর নিকট থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বভাবধর্মের আচরণ পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা সমাজ ও জাতির কল্যাণকর হয়। কিন্তু যখনি তারা স্বভাবধর্ম বিরোধী আচরণ করে, তখনি তা সমাজ ও জাতির জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে।

সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে বর্তমান পৃথিবীতে ধর্মের সংখ্যা কয়েক হাযার হবে। তার মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি ধর্ম সম্পর্কে কমবেশি সকলে অবহিত।

আলোচিত ধর্মগুলোর মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম। হিন্দুধর্মের উৎস ও প্রাচীনত্ব নিয়ে নানা রকম মতভেদ রয়েছে। হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রী গোবিন্দ দাস তাঁর Hinduism গ্রন্থে বলেন, No defination is possible, for the very good reason that Hinduism is absolutety indefinite. 'হিন্দুধর্মের কোন সংগা দেওয়া সম্ভব নয়; কারণ হিন্দুধর্ম পরিপূর্ণভাবে অনির্দিষ্ট'। তবে ভারতবর্ষই যে হিন্দুধর্মের উৎসভূমি এ বিষয়ে তেমন কোন দ্বিমত নেই। প্রাচীন কালে হিন্দুধর্ম আর্যধর্ম নামে পরিচিত ছিল এবং এর

১. সূরা আর-রূম, আয়াত ৩০।
২. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৯০।

অনুগামীদের আর্য বলা হত।[৩] হিন্দু ধর্মের অপর নাম সনাতন ধর্ম। এ ধর্মের মূল গ্রন্থ বেদ বিধায় একে বৈদিক ধর্মও বলা হয়ে থাকে। হিন্দু ধর্মের মূলমন্ত্র হল শান্তি, প্রেম, সহানুভূতি ও সেবা। হিন্দুধর্ম বিশ্বাস মতে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান।[৪] কালের বিবর্তনে হিন্দুধর্মের মধ্যে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপাত প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে। তাছাড়া জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, শৈবধর্ম প্রভৃতি হিন্দুধর্ম থেকেই উদ্ভূত।

একথা কারো অজানা নয় যে, হিন্দুধর্মের অনুসারীরা বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী। সেই বহু দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতার উদ্দেশ্যে তাদের অসংখ্য ভক্ত পূজা নিবেদন করে থাকে। কারণ ধর্মমতে উক্ত তিন দেবতা তিনটি স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী। ব্রহ্মা সৃষ্টিকারক, বিষ্ণু সংরক্ষক এবং মহেশ্বর বা শিব সংহারক। ধর্মের বিধানে বলা হচ্ছে, আসলে এ তিন দেবতা একই পরমেশ্বরের তিনটি রূপ, তিনটি ভিন্ন দেবতা নয়। একই পরম সত্তার ভিন্ন ভিন্ন রূপমাত্র। জগতের সব কিছুর মূলে একই চৈতন্য সত্তার অস্তিত্ব। অর্থাৎ সমস্ত দেবতার সত্তা এক পরম সত্তায় অধিষ্ঠিত। সেই পরম সত্তা ভিন্ন দেবতাদের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই।[৫]

শুধু ঈশ্বর ধারণায় নয়, হিন্দুধর্ম এক শাশ্বত নৈতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী। শৃঙ্খলার অন্যতম পন্থা হল কর্মফল। ধর্মমতে বলা হয়েছে, মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। যে যেরূপ কর্ম করবে, তাকে সেরূপ ফল ভোগ করতে হবে। সৎ কর্মের ফল পুণ্য ও সুখ, অসৎ কর্মের ফল পাপ এবং দুঃখ। কোন জীবের পক্ষেই কর্মফল এড়ানো সম্ভব নয়।

সংক্ষিপ্ত এ আলোচনা থেকে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, হিন্দুধর্মের বহু ঈশ্বরের মূলে আছে এক পরম সত্তা। আর তিনিই মহান আল্লাহ। তাছাড়া কর্মফলের বিষয়টিও ইসলামী বিশ্বাসের অনুকূলে।

বর্তমান বিশ্বে আলোচিত ধর্মের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম অন্যতম। অনুসারীর দিক দিয়ে এ ধর্ম সবার শীর্ষে। আজকের দিনে প্রতি তিনজনে একজন খৃষ্টান। আল্লাহ প্রেরিত নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর আনীত ও প্রচারিত ধর্মই বর্তমানে খৃষ্টান ধর্ম নামে পরিচিত। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থের নাম বাইবেল। যদিও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঈসা (আঃ)-এর উপরে যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল তার নাম 'ইঞ্জিল'। বর্তমানে বাইবেলের দুটি সংস্করণ আছে, Old Testament এবং New Testament. মৌলিকত্বের বিচারে খৃষ্টানধর্ম ইলাহী ধর্ম। কিন্তু ঈসা (আঃ)-এর জন্ম, অতঃপর তাঁকে উঠিয়ে নেয়াসহ বহু বিষয় নিয়ে কালের বিবর্তনে এ ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে নানা রকম মতভেদ সৃষ্টি হয়। যেমন বর্তমান প্রগতিবাদী খৃষ্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। তাদের মতে স্রষ্টার তিনটি রূপ আছে- পিতা (God the Father), পুত্র (God the Son) ও পবিত্র আত্মা (God the Holy spirit)। এ মতবাদ অনুসারে পিতা স্রষ্টা সকল কিছুর আদি উৎস; অতঃপর পুত্র হিসাবে তিনি যীশুর মধ্যে মূর্ত এবং পবিত্র আত্মা হিসাবে তিনি সকল সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান। এই মতের অনুসারীরা যীশুকে স্রষ্টার পুত্র হিসাবে মনে করেন এবং যীশু স্রষ্টার অবতার (Incarnation of God)। অবশ্য এই ত্রিত্ববাদের ধারণাটি বাইবেলের New Testament সৃষ্ট, যা Old Testament-এ নেই। এগুলো তাদের নিছক ভ্রান্ত বিশ্বাস। এ ধরনের নানা ভ্রান্ত ধারণা, মত, চাতুরী, গোঁয়ার্তুমি, স্ববিরোধীতা ইত্যাদির কারণে খোদ চিন্তাশীল খৃষ্টানদের নিকটে বাইবেল সবচেয়ে ধ্বংসকারী ও বিপজ্জনক গ্রন্থ হিসাবে চিহ্নিত। যেমন- বাইবেল সম্পর্কে Alan Watts বলেন, It is a dangerous book, though by no means an evil one. এ প্রসঙ্গে James Harvey তাঁর Of the Bible বলেন, We see nothing work-while in the book. It is most evil, injurious, fallacious, divisive book ever written. It has caused more desaths, tortures and suffering than any other book ever written. It has been the most oft-used instrument for holding back human progress for thousands off years. It has been the cause of more wars than any other book or tyrant of human characteristic. অর্থাৎ এ গ্রন্থে প্রয়োজনীয় কোন কিছু আমরা দেখি না। এ যাবত রচিত গ্রন্থের মাঝে এটা সর্বাধিক মন্দ, অন্যায়সাধক, ভ্রান্তিমূলক, বিভেদ ও বিবাদ সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। হাযার হাযার বছর ধরে মানুষের প্রগতিকে আটকিয়ে রাখার জন্য এ গ্রন্থ বারে বারে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ গ্রন্থ যত যুদ্ধ বিগ্রহের কারণ হয়েছে তেমন কোন শাসক, অত্যাচারী মানব চরিত্রে তা হয়ে ওঠেনি।

এমনিভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে বিশ্বের সকল প্রসিদ্ধ ধর্মের মূল কথার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوْحاً وَّالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে; যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি কর না'।[৬]

এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) নিজেও বলেন, 'নবীগণ পরস্পরে বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মায়েরা পৃথক। কিন্তু তাঁদের সকলের দ্বীন এক'।[৭] তাছাড়া পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে প্রসিদ্ধ নবী ও রাসূলগণ যাঁদেরকে ঐসব বিকৃত অনুসারীগণ আপন আপন নবী বা রাসূল বলে গর্ববোধ করে থাকেন তাঁরা অকপটে নিজেদের মুসলিম পরিচয় প্রকাশ করেছেন। যেমন ইবরাহীম (আঃ) ও ইয়াকুব (আঃ) তাদের সন্তানদের উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথকভাবে ওছিয়াত করেন যে, হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না *(বাকারা ১৩২)*। ঈসা (আঃ)ও নিজে ও তাঁর সাথীদের কে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়েছেন *(আলে ইমরান ৫২)*। অর্থাৎ মানব সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ নবী পর্যন্ত যুগে যুগে সৃষ্টিকর্তার মনোনীত যে সকল ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব ঘটেছে, তাদের আনীত ধর্মের মৌলিকত্বে কোন প্রভেদ নেই। মূলত সকল ধর্ম প্রচারকের মূল দাওয়াত ছিল একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং অন্য কাউকে তাঁর সঙ্গে শরীক করবে না। এক কথায় তাওহীদ।

পরিশেষে বিশ্বের প্রসিদ্ধ ধর্মসমূহের মধ্য হতে দু'একটি ধর্মের বিধানের বিশ্লেষণে এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শাশ্বত ঘোষণার মাধ্যমে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকলের আনীত ধর্ম এক ও অভিন্ন এবং তা ইসলাম। ইসলাম ভিন্ন আর যেসব ধর্ম রয়েছে তা মূলত নিছক কুসংস্কার, মিথ্যা ও বাস্তবতা বিবর্জিত অলীক কল্পনার সমষ্টি।

৩. প্রমোদবন্ধ সেনগুপ্ত, ধর্মদর্শন, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ৪৪২।
৪. তদেব, পৃ. ৪৪৩।
৫. তদেব, পৃ. ৪৫৪।
৬. সূরা আশ-শূরা, আয়াত ১৩।
৭. বুখারী, মুসলিম, হাদীছ নং ২৩৬৫; মিশকাত-আলবানী, হাদীছ নং ৫৭২২।

আজকের সুশীল মুসলিম যুবসমাজের কর্তব্য

মূল : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী
অনুবাদ : হাশেম আলী

আমি আমার এই বক্তব্যে তোমাদের এটা বলছিনা যে, তোমরা সকলেই মুজাহিদ ইমাম ও মুহাক্কিক ফকীহ বনে যাও। যদিও এটা আমার ও তোমাদের জন্য আনন্দের বিষয়। যেহেতু বিদ্বানগণের পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবে ও বিশেষত্বের বিভিন্নতার দরুণ স্বাভাবিকভাবেই এটি অসম্ভব, সেহেতু এ সম্পর্কে আমি এখানে দু'টি বিষয় উপস্থাপনের মনস্থ করেছি :-

প্রথমত : তোমরা সেই বিষয়ে সতর্ক হবে যা অন্যরা ছাড়াও আজকের দিনের অনেক সুশীল মুমিন যুবকের নিকটে অস্পষ্ট। তা হল তারা বর্তমানে কতিপয় মুসলিম লেখক যেমন সাইয়িদ কুতুব, মওদুদী (রহঃ) প্রমুখের লেখনী ও প্রচেষ্টার বদৌলতে অবগত হয়েছে যে, নিশ্চয় বিধান প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্রই রয়েছে। এক্ষেত্রে তার সাথে কোন মানুষ অথবা সংস্থার কোন অংশীদারিত্ব নেই। তাঁরা (মাননীয় লেখকগণ) এর দ্বারা 'শাসন কর্তৃত্ব মহান আল্লাহ্র' বুঝিয়েছেন।

আমি বলব, বর্তমান সময়ে এই যুবসমাজের অনেকেই এ ব্যাপারে এখনও সতর্ক হয়নি যে, বিধান প্রণয়নে আল্লাহ্র সাথে অংশীদারিত্ব নাকচের বিষয়টি আল্লাহকে ছাড়া আল্লাহ্র বিধান সমূহের কোন বিধানে ভুলকারী মুসলমানের অনুসারী হওয়া অথবা আল্লাহ্র সাথে বিধান প্রণেতা হিসেবে আত্মনিয়োগকারী কাফেরের অনুসরণ করা এবং তার আলেম অথবা জাহেল হওয়ার মাঝে কোনই পার্থক্য নেই। এগুলোর প্রত্যেকটি উল্লেখিত মূলনীতির (শাসন কর্তৃত্ব মহান আল্লাহ্র) বিরোধী। যে মূলনীতির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে যুবসমাজ। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

আমি চাই, তোমরা এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং আমি এ বিষয়ে তোমাদেরকে বুঝাতে চাই। কেননা বোঝানো মুমিনদের উপকারে আসে *(যারিয়াত ৫৫)*।

আমি তাদের অনেককে আল্লাহ্র শাসন কর্তৃত্বের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য প্রশংসনীয় ইসলামী চেতনা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বক্তব্য দিতে শুনেছি এবং শুনেছি কুফরী শাসনের (অসার) নিয়মনীতির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে। এটা ভাল। এখন যদিও আমরা তা পরিবর্তন করতে সক্ষম নই। তবে তা করা অবশ্যই সম্ভব। আমাদের অনেকের মধ্যে উপরোক্ত মূলনীতির বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। সাবধান! জেনে রাখ, এটাই হচ্ছে তাক্বলীদের মাধ্যমে ধর্মকর্ম পালন করা এবং এর দ্বারা কিতাব ও সুন্নাহ্র দলীলকে প্রত্যাখান করা।

এ ধরনের উদ্যমী বক্তাকে যদি তুমি কোন আয়াত অথবা হাদীছ বিরোধী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সতর্ক কর তাহলে সে সতর্ক না হয়ে বরং তৎক্ষণাৎ মাযহাবী যুক্তি-তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, সে তার এই ধরনের কর্মকাণ্ড দ্বারা উক্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিকে লঙ্ঘন করে। যে মূলনীতির দিকে মানুষকে সে আহ্বান জানায়। আল্লাহ বলেন, 'মুমিনদের বক্তব্য কেবল একথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলেন, আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম' *(নূর ৫১)*। সুতরাং তার উচিৎ কুরআন-হাদীছের দলীল শ্রবণের সাথে সাথে দ্রুত তার নিকট আত্মসমর্পণ করা। কেননা এটাই প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয়। পক্ষান্তরে তাক্বলীদের আশ্রয় নেওয়া উচিৎ নয়। কেননা তা মূর্খতার পরিচায়ক।

অপর বিষয়টি হচ্ছে, প্রত্যেক মুমিনের জন্য যতটুকু সম্ভব ততটুকু তাহকীক করা উচিত। যদিও তা ইজতিহাদ ও সূক্ষ্ম তাহকীকের পর্যায়ে উন্নীত না হয়। কেননা এটা শুধু বিশেষজ্ঞদের কাজ। তোমাদের প্রত্যেকেই সাধ্যমত এককভাবে শুধু তারই অনুসরণ করবে। তোমরা যেমন তোমাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক জেনে তার ইবাদত কর, ঠিক তেমনি তোমরা তোমাদের অনুসরণের ক্ষেত্রে এককভাবে শুধু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এরই ইত্তেবা বা অনুসরণ করবে। অতএব তোমাদের উপাস্য এক এবং তোমাদের অনুসরণীয় ব্যক্তিও এক। এর দ্বারাই তোমাদের 'আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল'-এর সাক্ষ্যদানকে বাস্তবায়িত করবে।

অতএব হে ভ্রাতৃমণ্ডলী! তোমরা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত হয়েছে এমন প্রতিটি হাদীছের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অভ্যস্থ করো। চাই তা আক্বীদাহগত বিষয়ে হোক কিংবা হুকুম-আহকাম বিষয়ে। আর চাই তা তোমার মাযহাবী ইমাম বা অন্য কোন ইমামও বলুন না কেন। কতিপয় ব্যক্তির রায় ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে রচিত নীতির আলোকে কোন নীতি গ্রহণ করবে না। কারণ তারা প্রকৃত মুজতাহিদ নন। ফলে উহা রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। আর তোমরা কোন মানুষের তাক্বলীদ করবে না তিনি যত বড় লোকই হন না কেন। তোমাদের নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী পৌঁছার পরেও কি তোমরা তার উপরে তাঁর (অনুসরণীয় ইমামের) বাণীকে প্রাধান্য দিবে?

জেনে রেখ, তোমরা শুধু রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ দ্বারাই উক্ত মূলনীতিকে তথা 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নাই জীবনের নীতি' এবং 'শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ্র' ইলম ও আমলে বাস্তবায়িত করবে। উহা [ইত্তেবায়ে রাসূল (ছাঃ)] ছাড়া আমাদের পক্ষে এমন কোন অনন্য কুরআনী প্রজন্ম সৃষ্টি করা বা গড়ে তোলা সম্ভব নয়, যে প্রজন্ম একাই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। এ কথাই বলেছেন একজন বিশিষ্ট মুসলিম দাঈ, তোমরা তোমাদের অন্তরে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম কর তাহলে তা তোমাদের জন্য তোমাদের যমীনে প্রতিষ্ঠিত হবে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই তা হয়ে যাবে।

আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রাখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুত তোমরা সবাই তাঁরই নিকটে সমবেত হবে' *(আনফাল ২৪)*। *(আল হাদীছু হুজ্জিয়াতুন, পৃঃ ৯০-৯৩)।*

পুত্রের প্রতি বাদশাহ মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ-এর উপদেশ

(৭ম উছমানীয় খলীফা দ্বিতীয় মুহাম্মাদ ৮৩৩ হিজরী/১৪২৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার মৃত্যুর পর ৮৫৫ হিজরীর ১৬ই মুহাররম মোতাবেক ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি মাত্র ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাসের পাতায় তাঁর শাসনামল উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিশেষ করে কনস্টান্টিনোপল বিজয় তার অনন্য কীর্তি। এতদুদ্দেশ্যে তিনি আড়াই লক্ষের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন। তিনি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ৮৫৭ হিজরীর ২৬শে রবীউল আউয়াল বৃহস্পতিবার মোতাবেক ৬ই এপ্রিল ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করেন। ৫৩ দিন অবরোধের পর ২৯ মে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল বিজয় করে ইতিহাসে মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ বা দিগ্বিজয়ী মুহাম্মাদ রূপে বরিত হন। তাঁর শাসনামলে সমাজে আদল ও ইনছাফ বিরাজমান ছিল। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁর সন্তানকে নিম্নোক্ত উপদেশ দেন- অনুবাদক)

এখন আমি মৃত্যুপথ যাত্রী। কিন্তু আমার কোন আফসোস নেই। কেননা আমি তোমার মত একজনকে উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে যাচ্ছি। তুমি ন্যায়নিষ্ঠ, সৎ ও দয়ার্দ্র হবে এবং কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই প্রজাদের উপর তোমার সহায়তার হাত প্রসারিত করবে। তুমি দ্বীন ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করবে। কেননা পৃথিবীতে এটাই মূলত বাদশাহের উপরে ওয়াজিব। সবকিছুর উর্ধ্বে তুমি দ্বীনী বিষয়কে প্রাধান্য দিবে। নিরবচ্ছিন্নভাবে দ্বীন প্রচারে ক্লান্তি বোধ করবে না। তুমি ঐ সকল ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত করবে না যারা দ্বীনের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় না, কাবীরা গুনাহ হতে বিরত থাকে না; বরং অন্যায়-অশ্লীলতায় আরো নিমগ্ন থাকে।

তুমি ধ্বংসাত্মক বিদ'আত পরিহার করে চলবে এবং এর প্রতি যারা তোমাকে উৎসাহিত করবে তাদের থেকে দূরে থাকবে। জিহাদের মাধ্যমে তুমি দেশের ভূখণ্ড বিস্তৃত করবে এবং বায়তুল মালের (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) সম্পদ অপচয় না হয় সে দিকে খিয়াল রাখবে। সাবধান! একমাত্র ইসলামের অধিকার ছাড়া প্রজাদের কারো সম্পদের দিকে তোমার হস্ত প্রসারিত করবে না। তুমি অভাবগ্রস্তদের খাদ্যের ব্যবস্থা করবে এবং যোগ্য ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করবে।

যেহেতু আলেমগণই রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোয় বিক্ষিপ্ত শক্তির উৎস, সেহেতু তুমি তাদের যথাযথ মর্যাদা দিবে এবং তাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। যখন তুমি অন্য কোন রাষ্ট্রে তাদের যোগ্য কারো সম্পর্কে অবগত হবে তখন তাকে তোমার নিকটে আহ্বান করবে এবং অর্থ-সম্পদ দিয়ে তাকে সাহায্য করবে। সাবধান! সাবধান!! সম্পদ ও সৈন্য (শক্তি) তোমাকে যেন প্রতারিত না করে। সাবধান! তুমি তোমার দরজা থেকে দ্বীনের অনুসারীদেরকে দূরে সরিয়ে দিবে না এবং দ্বীনী বিধি-বিধানের বিপরীত কোন কাজ করবে না। কারণ দ্বীনই আমাদের লক্ষ্য, হেদায়েতই আমাদের পথ এবং এর মাধ্যমেই আমরা বিজয় লাভ করব।

(হে বৎস!) তুমি আমার নিকট থেকে এই উপদেশটুকু গ্রহণ কর। এই দেশে আমি উপস্থিত হয়েছি (আগমন করেছি) ছোট্ট একটি পিপীলিকার ন্যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে এতসব বড় বড় নিয়ামত দান করেছেন। অতএব তুমি আমার নীতি অবলম্বন করো এবং আমার পদাঙ্ক অনুসরণ কর। এই দ্বীনকে শক্তিশালী করতে ও এর অনুসারীদের সম্মান করতে তুমি নিজেকে আত্মনিয়োগ কর। খেল-তামাশায়, বিলাসিতায় অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয় করো না। কেননা এটাই ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

(ড. আলী মুহাম্মাদ আছ-ছাল্লাবী, আদ-দাওয়াতুল উছমানিয়্যাহ, পৃঃ ১৩৫)

মিশর : উমার বিন খাত্তাবের নিকট প্রেরিত আমর বিন আছের চিঠির বর্ণনায়

জেনে রাখুন হে আমীরুল মুমিনীন! নিশ্চয়ই মিশর সবুজ গাছপালায় ঘেরা ধূসর অঞ্চল। এর দৈর্ঘ্য এক মাসের পথ এবং প্রস্থ দশ দিনের পথ। ধূসর পাহাড় ও বালিকণা একে বেষ্টন করে রেখেছে। এর মধ্য দিয়ে নীল নদের প্রভাতী ও সান্ধ্য হাওয়া প্রবাহিত হয়। সূর্য ও চন্দ্রের পরিক্রমার ন্যায় এতে জোয়ার ও ভাটা আসে। এমন একটা সময় রয়েছে যখন নীল নদের ফেণা ও মক্ষী বেশি হয়। ভূপৃষ্ঠের ঝর্ণাধারাগুলো একে প্রসারিত করে। এমনকি যখন তার ধূলিকণা দূষিত হয় এবং এর দুকূলে ঢেউগুলি বড় আকার ধারণ করে, তখন ছোট্র ছোট্র নৌকা ও বোট ছাড়া এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যাওয়া যায় না। এগুলি তখন কল্পনার জগতে নাড়া দেয়। এর জলরাশি পরিপূর্ণরূপে বৃদ্ধি পেয়ে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। তখন ভগ্নহৃদয়ে এর অধিবাসীগণ জমি চাষাবাদ করে এবং শস্যবীজ বপন করে মহান আল্লাহ্র নিকট বাড়তি ফসল কামনা করে। তারা অন্যের উপকারার্থে পরিশ্রম করে এবং অন্যরা বিনা প্রচেষ্টায় তাদের নিকট থেকে ফায়েদা লাভ করে। অতঃপর যখন ক্ষেতের শস্য বড় ও উজ্জ্বল হয় তখন তাকে শিশিরকণা সিক্ত করে এবং ভিজা মাটি তাকে রসদ যোগায়।

মিশর যেন ধবধবে মুক্তা, কালো আম্বর, সবুজ পান্না ও নকশাখচিত রেশমী বস্ত্র। মহান আল্লাহ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এ দেশকে বরকতের বারিধারায় সিক্ত করুন, এর উন্নতি-সমৃদ্ধি ঘটান এবং এর বাসিন্দাদের সুখে-শান্তিতে রাখুন!

এই দেশের নেতার ব্যাপারে কোন হীন-নিকৃষ্ট লোকের কথা গৃহীত হয় না, যথাসময় ছাড়া এর শস্যের কর আদায় করা হয় না এবং আয়ের এক তৃতীয়াংশ বাঁধ নির্মাণ ও খাল খননে ব্যয় করা হয়। এমত পরিস্থিতিতে যখন শ্রমিকদের অবস্থা স্থিতিশীল হয় তখন সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা শুরু ও শেষে তাওফীক দান করুন!

(ইবনু তাগরী বারদী, আল-নুজূমুয যাহিরাহ ফী মুলূকি মিসর ওয়াল কাহিরাহ ১/১২)।

অনুবাদ : শিহাবুদ্দীন আহমাদ

সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার

*['বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবে**'র এই স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন 'তাওহীদের ডাক'-এর পক্ষ থেকে **মুযাফ্ফর বিন মুহসিন** ও **নূরুল ইসলাম**]*

(৪র্থ পর্ব)

(১৪) সোহাগদল, পিরোজপুর : ১৯৯৭ সালের নভেম্বরে 'আন্দোলন'-এর নেতাকর্মীদের নিয়ে দক্ষিণবঙ্গে গিয়েছি শিক্ষাসফরে। সাথে তিনটি মাইক্রো। পূর্বে দেওয়া প্রোগ্রাম মোতাবেক আমরা বিরাট কাফেলাসহ সোহাগদল পৌঁছলাম। নদীর ওপারে গাড়িগুলো রেখে আমরা নৌকায় করে শ্লোগান দিতে দিতে সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদের কিনারে গিয়ে নৌকা থেকে নামলাম। ঐ মসজিদটি কিছুদিন পূর্বে তাওহীদ ট্রাস্টের সৌজন্যে পুনর্নির্মিত হয়। একদিন আগেই মাওলানা মুসলিম ও অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম পৌঁছে গিয়েছিলেন। ওনারা স্থানীয় ধনবান বড় ব্যবসায়ী শাহ বাহাদুর ছাহেবের আলীশান দ্বিতল বাড়িতে অবস্থান করছেন। আমার জন্য ঐ বাড়িতে ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথীদের মসজিদে রেখে আমাকে ঐ বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হল। লক্ষ্য করলাম- ছাদে টিভি এ্যান্টিনা। আমি বারান্দায় উঠেই নেমে এলাম। যেলা সংগঠনের অর্থ সম্পাদক স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আযীযুল ইসলামকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে নিয়ে বললাম, আপনার বাড়িতে নিয়ে চলুন। বেচারা বিপদে পড়ে গেলেন। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। আমিই আগে আগে হেঁটে চলেছি। বেশ দূরে ও ভিতরে ওনার বাড়ি। বারান্দায় উঠতেই দেখি বিরাট আয়নায় বাঁধানো আরবীতে 'আল্লাহ ও মুহাম্মাদ' লেখা পোষ্টার টাঙানো আছে। এক পা উঠেই নেমে এলাম। ওনাকে বললাম, ওটা আগে সরিয়ে ফেলুন। মাও. জাহাঙ্গীরকে ইঙ্গিত করলাম। তারা কয়েকজন মিলে ওটা নামিয়ে নিল। বাড়ীওয়ালাকে বললাম, বাড়িতে প্রাণীর ছবি যদি কিছু থাকে, সব নামিয়ে ফেলুন। সবকিছু পরিষ্কার ও বিছানাপত্র ঠিকঠাক করতে প্রায় আধাঘন্টা লাগলো। এতক্ষণ আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। জাহাঙ্গীরকে বললাম সাথীদের মধ্যে আলেমগণ সকলে এখানে আমার সাথে থাকবেন। মাত্র একজন মসজিদে থাকবেন কর্মীদের তদারকি করার জন্য। অতঃপর বাদ মাগরিব আমি হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনস্থলে গেলাম। নদীর অপর পাড়ে শর্ষিণা কামিল মাদরাসা ও পীর সাহেবের খানকা। মাদরাসা থেকে অনেক ছাত্র ও কয়েকজন শিক্ষক এসেছেন। আমার বক্তৃতা শেষে প্যান্ডেলেই ১২ জন আহলেহাদীছ হলেন ও ছহীহ আক্বীদা মোতাবেক চলার শপথ নিলেন। পীর ছাহেবের এলাকার জনগণের আগ্রহ ও ভক্তি দেখে এবং বাপ-দাদার আচরিত মাযহাব ছেড়ে এত সহজভাবে 'আহলেহাদীছ' হতে দেখে আমরা বিস্মিত হলাম।

পরদিন সকাল ৭টায় রওয়ানা হব। বাদ ফজর মসজিদে সংক্ষিপ্ত দারস দিলাম। তারপর প্রৌঢ় বয়সের ইমাম ছাহেব আমাকে মসজিদের একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন, স্যার! আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে আজ আমি আপনাকে 'সোনার মেডেল' উপহার দিতাম।' বললাম, কেন? বললেন, স্যার! আপনার একটা আচরণই গতরাতে এলাকার পরিবেশ পাল্টে দিয়েছে। আপনি যে টিভি-ওয়ালা ধনী লোকের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছেন, আবার হেড মাষ্টারের বাড়ী গিয়েও শিরক-বিদ'আত দূর না করে ঘরে ঢোকেননি, একথা সাথে সাথে সর্বত্র প্রচার হয়ে গেছে। ফলে শর্ষিনা পীরের দুষ্ট মুরীদান, যারা আপনার সম্মেলন পণ্ড করতে এসেছিল, তারাই গতরাতে আপনার হাতে বায়'আত নিয়ে 'আহলেহাদীছ' হয়ে গেছে।' সবার মুখে আপনার প্রশংসা শুনে আমার মনটা ভরে গেছে। সবাই বলছে, আমাদের পীরের কাছে ঘেঁষা যায় না। অথচ এদের 'আমীর' সবার সাথে মেশে। কোন নযর-নেয়ায নেয় না।' বললাম, দো'আ করুন আল্লাহ যেন আমাদের দাওয়াত কবুল করেন'।

(১৫) চটেরহাট, বাগেরহাট : ১৯৯৭ সালের নভেম্বরে দক্ষিণবঙ্গ সফরের এক পর্যায়ে পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমরা এখানে এলাম। এখানে ঢালীরখণ্ড সহ দু'তিনটা গ্রাম 'আহলেহাদীছ'। এরা পূর্ব থেকেই আমার আব্বার ভক্ত। মংলা পোর্ট পেরিয়ে বেশ কিছু দূরত্বে এলাকাটির অবস্থান। এখানকার আহলেহাদীছ ইজারাদার গোষ্ঠী খুব প্রভাবশালী। এরা কয়ভাই রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। আব্বাকে এরা খুব ভক্তি করে। মংলা উপযেলা চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে এরা অধিষ্ঠিত। এদেরই একজনের আল-হেলাল দোতলা লঞ্চে আমাদের সুন্দরবন ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়েছে। যিনি ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে আব্বার কাছে এসেছেন তার পিতার সাথে, সে গল্প করলেন। 'ডঃ গালিব তোরণ' লেখা বিরাট তোরণ পেরিয়ে চটেরহাট বাজার এলাকায় ঢুকতে বিবেকে ধাক্কা দিচ্ছিল। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। নিষেধ করলাম এসব লিখতে। রাতে সম্মেলন হল। চারপাশে হানাফী ও পীরের মুরীদান। সবাই এলো, দেখলো, শুনলো। আলহামদুলিল্লাহ

আমার বক্তৃতার পর প্যাণ্ডেলেই ২২ জন 'আহলেহাদীছ' হল ও বায়'আত করল। অবশ্য এখানকার শাখা 'যুবসংঘ'-এর দু'জন- যারা রাজশাহী তাবলীগী ইজতেমায় নিয়মিত যেত, তারা আগেই কিছু প্রচারের মাধ্যমে ও বই-পত্র বিতরণের মাধ্যমে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল।

শিক্ষাসফরের সাথে সাথে এইভাবে দাওয়াতী সফলতায় আমরা প্রাণভরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। এই সফরের পুরা রিপোর্ট ঐ সময়ের মাসিক আত-তাহরীকে বেরিয়েছিল।

(১৬) কাচিয়া-চৌমুহনী, বোরহানুদ্দীন, ভোলা : ১৯৯৮-এর ফেব্রুয়ারীতে এখানকার মাদরাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত পাঁচদিন ব্যাপী বার্ষিক তাফসীর মাহফিলে এবারই প্রথম আমরা সবাই 'আহলেহাদীছ' বক্তা। অবশ্য এটা ছিল গত কয়েক বছর যাবত ঢাকার উত্তরায় তাওহীদ ট্রাস্ট অফিসে দক্ষিণাঞ্চলের হানাফী আলেমদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত মতবিনিময় সভার ফসল। বাউফল সিনিয়র মাদরাসার প্রবীণ অধ্যক্ষ মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আমাকে আগেই বললেন, এলাকায় তাফসীর মাহফিল বলতে ইউসুফ-যুলেখার কাহিনী বুঝায়। বক্তারা এই গল্পেই পাঁচদিন চালিয়ে দেয়। আপনি এ বিষয়ে কিছু বলবেন। আমি আমার ভাষণের শুরুতেই উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করি এবং সূরা ইউসুফের তাওহীদভিত্তিক শিক্ষা ও আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুলের পুরস্কার সম্বলিত সারমর্ম সংক্ষেপে বিবৃত করলাম। অতঃপর মূল ভাষণের দিকে এগিয়ে গেলাম। ভাষণ শেষে শ্রোতাদের চাপে আমাকে পুনরায় দাঁড়িয়ে ওয়াদা করতে হল যে, আমি আল্লাহ চাহে তো প্রতি বছর এলাকায় আসব। কিন্তু এ যাবৎ আর যাওয়া হয় নি। আমি বক্তাদের নির্ধারিত বিষয়বস্তু দিয়েছিলাম। ফলে নির্ধারিত আয়াতসমূহের আলোকে তাফসীর সকলেরই দৃষ্টি কাড়ে। এছাড়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এলাকার আলেমদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যা অত্যন্ত ফলদায় হয়েছিল। ঐ সময় পার্শ্ববর্তী পাঁচটি মাদরাসায় ছুটি দেওয়া হয় ও শিক্ষকরা প্রায় ৬০জন এখানে আসেন। শুক্রবারের জুম'আ'র খুৎবা ও আমার ইমামতিতে জুম'আর ছালাতের পূর্বে মসজিদের মুছল্লী সবাই 'আহলেহাদীছ' হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ছিল নিতান্তই বিস্ময়কর! শুনেছি আমরা আসার পর এলাকায় পাঁচটি মসজিদের মুছল্লী সব 'আহলেহাদীছ' হয়ে গেছে। মাওলানা ছফীউল্লাহর নেতৃত্বে আজও এলাকায় দাওয়াত অব্যাহত রয়েছে। এই মাওলানা ছফীউল্লাহ উত্তরায় ট্রাস্ট অফিসে মতবিনিময় সভা শেষে নিজস্ব মন্তব্যে বলেছিলেন, দেউবন্দে যখন ফাতাওয়া আলমগীরী পড়তাম, তখন অতি পবিত্র জ্ঞানে আগে ওযূ করতাম। কিন্তু আজ দেখছি যে, এটা এমন ফাৎওয়ার বই, যা পড়লে পুনরায় ওযূ করতে হবে।' ছফীউল্লাহর পূর্বে একই থানাধীন দেউলা গ্রামের বক্তা মাওলানা মোশাররফ হোসেন আকন্দ আহলেহাদীছ হন। স্থানীয় চার চারবারে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান মাওলানা আবুল হাশেম ঐ সফরের উক্ত মত বিনিময় সভা শেষে নিজ মন্তব্যে বলেন, 'আপনাদের এই শুভ উদ্যোগ যদি প্রতি থানায় ও ইউনিয়নে ছড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ দেশের অধিকাংশ মানুষ 'আহলেহাদীছ' হয়ে যাবে।'

ছফীউল্লাহর মুখে শুনেছি যে, আমরা আসার পর মাওলানা কামালুদ্দীন জাফরী- যিনি ভোলার বাসিন্দা- এলাকায় এক তাফসীর মাহফিলে গেলে এলাকাবাসী আমার নাম করে বিভিন্ন ফৎওয়া জিজ্ঞেস করলে উনি পরিষ্কার বলেছেন যে, ড. গালিব যা যা বলে গেছেন, সবই ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক। আপনারা ওগুলো মেনে চলবেন। আমিও এখন থেকে ঐ সব ছহীহ মাসআলার উপরে আমল করব, আপনারাও করবেন।' শুনেছি, জাফরী ছাহেবের নরসিংদী জামে'আ কাসেমিয়া মাদরাসায় প্রকাশ্যে হাদীছ ভিত্তিক আমল চালু হয়ে গেছে। *আলহামদুলিল্লাহ*।

(১৭) কুয়েত : ১৯৯২ সালের ১৯-২২ শে জানুয়ারী সদ্য সমাপ্ত ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও কুয়েতের বিরুদ্ধে ইরাকী সরকারের বর্বর আচরণের প্রতিবাদে আয়োজিত সম্মেলনে কুয়েত সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ থেকে আমরা সাতজন গমন করি। ৩৫টি দেশের ৪২৬ জন প্রতিনিধির বিরাট সম্মেলন। সম্মেলনের ফাঁকে কুয়েতের আহলেহাদীছ সংগঠনের (ইহয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী) নেতৃবৃন্দ তাদের মিলনায়তনে পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া ও সুদান-এর আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে এক সম্বর্ধনা সভায় দাওয়াত দেন। ড. বারী স্যার মওজুদ থাকায় আমি নিশ্চিন্তেই ছিলাম। কিন্তু মঞ্চে গিয়ে বসার জন্য যখন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি বক্তাদের আহবান করা হল, তখন বাংলাদেশের পক্ষে আমার নাম ঘোষণা করা হল। অথচ আমার কোন প্রস্তুতি নেই। ভাগ্য ভাল যে, আমার নাম পড়ল পাঁচ নম্বরে। প্রত্যেকের ১০ মিঃ সময়। কিন্তু কেউই সময় মানতে পারছেন না। ফলে পরিচালকের তাকীদমূলক ঘন্টার ধ্বনি প্রত্যেকের ভাগ্যে জুটল। পাকিস্তানের সাজিদ মীর কেবল ইংরেজীতে বললেন। বাকীরা আরবীতে। আমি ৪০ মিনিট সময় পেয়ে আরবীতে বক্তব্য ঠিক করে ফেললাম মঞ্চে বসেই। তারপর দাঁড়ালাম বুকে বল সঞ্চয় করে। অন্যের ভাষায় তাদের সামনে বক্তৃতার অভিজ্ঞতা তখনও হয়নি। তবুও মনের জোরে বক্তব্য ভালই জমল। অন্তত: দু'বার সমাবেশে 'আলহামদুলিল্লাহ' ধ্বনি উঠল। ঠিক সাড়ে নয় মিনিটে বসে গেলাম। তাতে ঘোষকের প্রশংসা পেলাম। আমার পরে নেপালের আব্দুল্লাহ্র বক্তৃতার পর অনুষ্ঠান শেষ হল। মঞ্চ থেকে নামতেই বিভিন্ন দেশের যুবনেতারা আমাকে ঘিরে ধরল। যুবসংগঠন পরিচালনা পদ্ধতি, দাওয়াতের কৌশল ইত্যাদি নিয়ে তাদের সাথে অনেক কথা হল। দ্বীনী মহব্বতে আপনজনের মত মিশে গেলাম সবাই একই সুত্রে। অটোগ্রাফ নিল অনেকে।

(১৮) **লাহোর, পাকিস্তান :** ১৯৯২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর লাহোরের 'মুরীদকে' ময়দানে ৫ লক্ষাধিক আহলেহাদীছের মহাসমাবেশে ১৪টি দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আমার উর্দূ বক্তৃতায় মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনি আমি আজও শুনতে পাই। মনে পড়ে সেদিন আবেগ মিশ্রিতকণ্ঠে বলেছিলাম, তোমরা আজ স্বাধীন পাকিস্তানের নাগরিক। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মূলে বাংগালী আহলেহাদীছ মুসলমানদের রক্ত মিশে আছে। ঐ দেখ এখান থেকে অনতিদূরে মুলকা, সিত্তানা, আস্তমাস্ত, পাঞ্জতার, আম্বেলা, বালাকোটের ধূলি ও মাটিতে সে রক্ত আজও মিশে আছে। তাদের বংশধর অনেকে এখনো এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে।- ঐ বক্তৃতার ক্যাসেট তারা দিয়েছিল। বাসায় ছিল। কিন্তু এখন ওটা খুঁজে পাচ্ছি না। সকল ক্যাসেটের প্লাস্টিকের কভারটা দেখছি। জনৈক চীনা প্রতিনিধি আমাকে জড়িয়ে ধরে আবেগে অনেক কথা বললেন। তার একটি কথা ছিল, 'বাংলাদেশে এমন আলেমও আছেন যারা এত ভাষায় কথা বলতে পারেন?'।

(১৯) **কলম্বো, শ্রীলংকা :** ১৯৯৩-এর ২৬-৩১শে আগস্ট কলম্বোতে অনুষ্ঠিত এশীয় দেশসমূহের ১ম ইসলামী সম্মেলন, সঊদী আরব ও শ্রীলংকা সরকারের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। শমশের মুবীন চৌধুরী তখন ওখানে বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার। ওনার বড়ভাই বযলুল মুবীন চৌধুরী তখন রাবি-র প্রফেসর। সে সুবাদে সৌহার্দ্যের সাথে আমার সাথে অনেক কথা হল। শেষদিন বাকী দেশের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখবেন। মঞ্চ থেকে দেশের নাম ধরে বক্তার নাম চাওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে মাওলানা এ কে এম ইউসুফ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান আমার দু'পাশে বসা। আমাকে দু'জনেই নাম দেবার জন্য বারবার তাকীদ করছেন। বললাম, আপনারা নেতা থাকতে আমি কেন? অবশেষে আমাকেই নাম দিতে হল। আরবী, ইংরেজী অথবা ফ্রেঞ্চ- তিনটির যে কোন একটি ভাষায় বলতে হবে। আমি আরবীতে বক্তব্য রাখলাম, 'আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ইসলামকে পেশ করার কৌশল'-এর উপর। স্ব প্রস্তুতির উপরই বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তুলতে হল। আলহামদুলিল্লাহ দেশের মান বাঁচল। মঞ্চে তখন উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন শ্রীলংকান প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে, স্পীকার হানুফা মুহাম্মাদ হানুফা, মালদ্বীপের বিচারমন্ত্রী, কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, সঊদী আরবের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী ড. তুর্কী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনের দাওয়াতপত্রে আমার পরিচিতি ছিল- 'আমীন, জমঈয়তে শুব্বানে আহলেহাদীছ বাংলাদেশ'। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সংগঠনের এই স্বীকৃতি আমার জন্য ছিল পরম তৃপ্তির ব্যাপার। এ সম্মেলনে ড. আব্দুল বারীর পরিবর্তে তার প্রতিনিধি হিসাবে অধ্যাপক শামসুল আলমও এসেছিলেন। সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে বিশেষ অনুমতি নিয়ে তিনিও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

(২০) **দুবাই, আরব আমিরাত :** ১৯৯৯-এর ডিসেম্বরে দুবাইয়ের এক মসজিদে রাজশাহীর সেলিম ছাহেবের বড় ভাইয়ের আমন্ত্রণে গিয়ে সেখানে তারাবীহ জামা'আতের পর পরে হঠাৎ করে এক বক্তৃতা করতে হয়েছিল উর্দূতে মুছল্লীদের দাবী মতে ২৫ মিনিট। ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার মুছল্লীরা বুঝতেই পারেনি যে আমি বাঙ্গালী। বক্তৃতার শেষভাগে আমি নিজের পরিচয় দিয়ে নোয়াখালীর একজন মাত্র বাঙ্গালীকে পেলাম।

(চলবে)

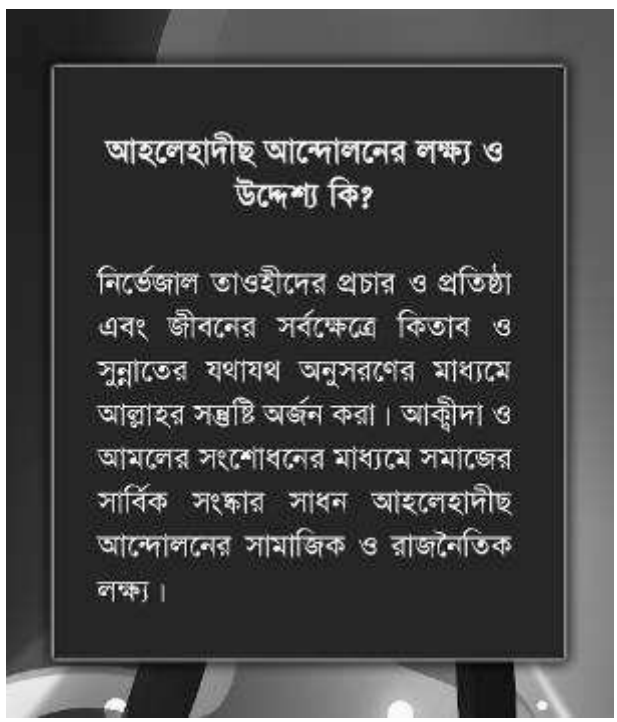

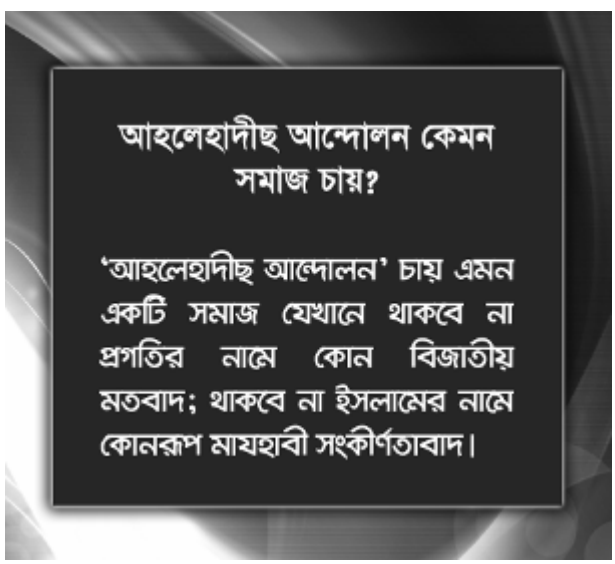

তিউনিসিয়ার পর মিসর : কি ঘটছে মধ্যপ্রাচ্যে?

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রায্যাক

উপস্থাপনা : মানুষের ভিতর নিজেকে জাহির করার একটা প্রবণতা সর্বদা কাজ করে। সে সবসময় চায় আরেকজনের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতে। এখান থেকেই সৃষ্টি হয় নেতৃত্বের লোভ ও ক্ষমতার নেশা। যারা প্রকৃত মুমিন হন তারা এই লোভ ও ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকেন। আল্লাহ চাইলে তারা ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভ করেন।

অন্যদিকে আরেকদল মানুষ রয়েছে যারা ক্ষমতা ও নেতৃত্বের জন্য লালায়িত। এদের জন্যই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে সবাই সফল হয়না। অনেকেই ব্যর্থ হয়। এই সফলতা ও ব্যর্থতা পরিবেশ ও পরিস্থিতির বিভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়। যেমন জনসমর্থন, সমরশক্তি, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সমর্থন, উত্তরাধিকার সূত্র ইত্যাদি। তবে এই সবগুলোর চাবিকাঠি সকলের অলক্ষ্যে আল্লাহ্র হাতে রয়েছে। এদের কেউ ক্ষমতা পেয়ে জনগণের কল্যাণ করতে চেষ্টা করে আবার কেউ স্বীয় স্বার্থ হাসিল করার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করে। আপন স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার অভিপ্রায়ে দেশ ও জাতির সার্বভৌমত্ব বিদেশী বেনিয়াদের কাছে বিকিয়ে দিতেও এরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

ইতিহাস সাক্ষী, এরা যতই শক্তিশালী, বিদেশী মদদপ্রাপ্ত ও সমরশক্তিতে সুসজ্জিত হোক না কেন এদের মসনদে একদিন না একদিন কাঁপন ধরবেই। মিসর ও তিউনিসিয়ায় যা হচ্ছে এটা তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিস থেকে ৩০০ কি:মি: দূরে অবস্থিত সিদি বুজিদ শহরের এক সবজি ফেরীওয়ালা ছিলেন মুহাম্মাদ বুয়াজিজি। ১৭ই ডিসেম্বর ২০১০ লাইসেন্সবিহীনভাবে শহরের রাস্তায় মাল বিক্রি করার অপরাধে তার ভ্যান বায়েজাপ্ত করে এক পুলিশ কর্মকর্তা। বিচার চাইতে তিনি সংশ্লিষ্ট দফতরে গেলে তার কথা শোনার সময় হয়নি সংশ্লিষ্টদের। ফলে ক্ষোভে-দুঃখে বাইরে বেরিয়েই তিনি নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন। পরে ১৭ দিন হাসপাতালে থাকার পর বুয়াজিজি মারা যান। মিডিয়ায় এই ঘটনা প্রচারিত হলে ক্ষোভের দানা বেঁধে উঠে সারাদেশে। ইতিপূর্বেই কর্মসংস্থানের জন্য অনেকদিন যাবৎ বেকার ছাত্ররা আন্দোলন করে আসছিল। ফলে এই ঘটনা প্রতিবাদ-বিক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। ক্ষোভে-রোষে উত্তাল হয়ে উঠে তরুণ সমাজসহ সর্বস্তরের জনতা। সরকারীভাবে কঠোরহস্তে এই বিদ্রোহ দমনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে সামরিক বাহিনীও অনাস্থা প্রকাশ করলে ১৪ই জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট বেন আলী মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হন এবং জরুরী অবস্থা জারী করেন। একই দিনে তিনি দেশ থেকে পলায়ন করে সউদী আরবে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। এভাবেই তার দীর্ঘ ২৩ বছরের শাসনামলের অবসান ঘটে। এ ঘটনারই রেশ যেয়ে পড়ে পাশ্ববর্তী মিসর এবং জর্ডান, ইয়েমেন, আলজেরিয়া, সুদান, আলবেনিয়া, গ্যাবন প্রভৃতি দেশে। যাকে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে 'ডমিনো ইফেক্ট' নামে। মাত্র ১৮ দিনের গণবিক্ষোভে মিসরে অহিংস গণআন্দোলনের মাধ্যমে যে বিশাল ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়েছে তা বিশ্ব রাজনীতিতে এক অবিস্মরণীয় ও যুগান্তকারী ব্যাপার। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় তিউনিসিয়ার পর মিসরে সংঘটিত অভূতপূর্ব গণবিপ্লবের উপর পর্যবেক্ষণমূলক আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

মিসর : প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি এবং আধুনিক সভ্যতার জন্মদাত্রী মিসর আফ্রিকার একটি সমৃদ্ধশালী মুসলিম রাষ্ট্র। আধুনিক মিসরের আয়তন ৩৮৬১১০ বর্গমাইল। তন্মধ্যে বাসোপযোগী জায়গা মাত্র ১৩৫৭৮ বর্গমাইল। বাকী সব ঊষর মরুভূমি। মিসরের উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে লিবিয়া, পূর্বে লোহিত সাগর ও দক্ষিণে সুদান অবস্থিত। প্রধান দু'টি শহর হচ্ছে কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া। দেশের অন্যতম প্রধান সম্পদ হল ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে সংযুক্তকারী সুয়েজ খাল, যা ১৮৬৯ সালে উদ্বোধন করা হয়। বর্তমান মিসরের জাতীয় আয়ের অধিকাংশ অর্থ এই খালের মধ্য দিয়ে চলাচলকারী জাহাজ থেকে প্রাপ্ত শুল্ক থেকে আসে। মিসরীয় জাতির প্রাণ হচ্ছে নীলনদ। এছাড়াও রয়েছে মিসরের বিখ্যাত পর্যটন শিল্প। যা ভ্রমণপিয়াসীদের আকর্ষণ করে।

মিসরের অতীত ইতিহাস : পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনভূমি মিসর। পবিত্র কুরআনে ইউসুফ (আঃ) ও তৎপরবর্তী মূসা (আঃ)-এর যুগে মিসরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা পাওয়া যায়। মিসরের অতীত ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও চমকপ্রদ। আধুনিক ইতিহাসবিদ কলিন মন্তব্য করেছেন, 'No country in the world has so illustrious, complex and rich history as Egypt.' ইসলামের সাথেও এর রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ইউসুফ (আঃ) ও মূসা (আঃ)-এর ঘটনাবলীর সাথে মিসর পুরোপুরি জড়িত। পরবর্তীতে ওমর (রাঃ)-এর আমলে আমর বিন আসের নেতৃত্বে মুসলিম সেনাদল মিসর জয় করে। এসময় বাইজান্টাইনীদের শাসনাধীন ছিল মিসর।

৯৬৯ খৃষ্টাব্দে ফাতেমীয়রা আব্বাসীয়দের নিকট থেকে মিসর দখল করে নেয়। ফাতেমী শাসকদের অধীনেই বিশ্ববিখ্যাত আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১১৭১ খৃষ্টাব্দে ক্রুসেডের রণ দামামা এবং সেলজুক তুর্কীদের উত্থানের

ফলে ফাতেমীয় শাসনের বিলুপ্তি ঘটে। সিরিয়ার শাসক নূরুদ্দীনের ভাতিজা সালাহুদ্দীন আইয়ূবী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করে মুসলিম জাতির এক চরম ক্রান্তিলগ্নে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ন হন। অন্যদিকে তিনি শীআ মতবাদের হাত থেকে সুন্নী ইসলামকে রক্ষা করেন। তাঁর এ বীরত্বগাঁথাও রচিত হয়েছে মিসরকে কেন্দ্র করে যা দেশটিকে ইসলামের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান করে দিয়েছে।

১৫১৭ থেকে ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত ওসমানীয়দের অধীনে মিসরীয় মামলুকরা স্বায়ত্বশাসন ভোগ করে। ১৭৯৮ সালে ফরাসী সমরনায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিসরকে করতলগত করেন। ১৮০১ সালে ফরাসীরা মিসর ত্যাগ করলে দেশটি ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৯৩৬ সালে বৃটিশদের হাত থেকে মিসর পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫২ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজতন্ত্র ও সংসদ দুটোরই বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। ১৯৫৪ সালে জামাল আব্দুল নাসের জেনারেল মোহাম্মাদ নাজিবকে সরিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাঈল ছয় দিনের যুদ্ধে চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে সিনাই উপত্যকা হারায় তেলআবিরের কাছে। ১৯৭০ সালে জামাল আব্দুন নাসেরের মৃত্যুর পর ভাইস প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত মিসরের প্রেসিডেন্ট হন। সোভিয়েত বলয় থেকে বের হয়ে তিনি মিসরকে মার্কিন বলয়ে প্রবেশ করান। ১৯৭৭ সালে তিনি আকস্মিকভাবে ইসরাঈল সফরে যান। ১৯৭৯ সালে ইসরাঈলের দখল করা সিনাই ফেরত পাওয়ার বিনিময়ে ক্যাম্প ডেভিড শান্তি চুক্তি করে প্রথম আরব দেশ হিসেবে ইহুদী রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃত দেন। এজন্য তাকে নোবেল পুরস্কারও দেয়া হয়। ১৯৮১ সালে এক বিক্ষুব্ধ আততায়ীর হাতে আনোয়ার সাদাত নিহত হন। এরপর দেশটির প্রেসিডেন্ট হন বিমান বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হোসনি মোবারক। তারপর থেকে দীর্ঘ ৩০ বছর তাকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছিল মিসরীয় সেনাবাহিনী।

কায়রোতে এক পক্ষকালের বিভীষিকা : মিসর মধ্যপ্রাচ্যের প্রেক্ষাপটে এক উন্নত দেশই বলা চলে। নিরাপত্তার দিক দিয়ে মিসরের সুনাম বরাবরই ছিল। কিন্তু ২৫ জানুয়ারী অপরিকল্পিত, অসংগঠিতভাবে ডাক দেয়া বিপ্লবের আহ্বানে আকস্মিকভাবে মিসরে যা ঘটে গেল তা অচিন্তনীয়। যারা টিভি চ্যানেলে নজর রাখছিলেন তারা পরিস্থিতি কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেছেন। তারপরও মিসরে অবস্থানরত সাংবাদিকদের লেখা ও সাক্ষাৎকার থেকে যা ফুটে উঠেছিল তা হল– সারা কায়রোয় যেন যুদ্ধাবস্থার ন্যায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। গুলি ও আগ্নেয়াস্ত্রের ঝনঝনানী যেন নিত্য পরিচিত হয়ে পড়েছে। রাস্তা ফাঁকা। কোন যানবাহন নেই। চারদিকে পিন-পতন-নীরবতা। জনজীবনের নিত্য কোলাহল হারিয়ে কায়রো যেন আর্তনাদ করে মরছে। হোটেলগুলো অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকছে। পকেটে টাকা থাকলেও কিছু কেনা যাচ্ছে না। যারা আন্দোলন করছেন তারা অনেকেই ছিয়াম রাখছেন। অনেকে আবার একটাই রুটি ভাগাভাগি করে ৫/৭ জন মিলে খাচ্ছে। তারা বলছে আমরা জানি আমরা যদি ঘরে ফিরে যাই তাহলে মোবারকের অনুগত বাহিনী আমাদের শেষ টিকিটা দেখে ছাড়বে। তাই মরতে হলে এখানেই মরব, তবু ঘরে ফিরে যাব না। এই রকম পণ নিয়ে ইতিমধ্যেই সরকারী হিসাব মতে ৩০০ এবং বেসরকারী হিসাব মতে ৫০০ জন মারা গেছে। এদের গণ গায়েবানা জানাযা হয়েছে তাহরীর স্কয়ারে। আহতও হয়েছে কয়েক হাজার। দেশের অনেক জায়গায় পানি, বিদ্যুৎ-এর সংকট। মোবাইল, ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। বিদ্রোহীরা ট্রেন লাইন উপড়ে ফেলায় দূরপাল্লার ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে। দেশের বিমান বন্দরগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে বিশ্ববিখ্যাত আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রয়েছে এবং সেখানে পাঠরত ১২০টি দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য নেয়া হয়েছে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রাস্তা-ঘাটে চুরি-ডাকাতি ও রাহাজানি হু হু করে বাড়ছে। যখন-তখন যে কেউ লুটপাট, ছিনতাই ও ডাকাতির শিকার হতে পারে এই ভয়ে কেউ বাড়ী থেকে বের হচ্ছে না। সেনাবাহিনী সদস্যরা রাস্তায় রাস্তায় টহল দিলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। মাঝে মাঝে রাস্তায় নেমে আসছে ট্যাংকবহর। সাজোয়া যান এবং আকাশে টহল দিচ্ছে জেট বিমান। এত কিছুর পরও জনগণ বিন্দুমাত্র টলছেনা। তারা এ মর্মে একাট্টা যে, মোবারকের পতন না হওয়া পর্যন্ত তারা তাহরীর স্কয়ার ছাড়বে না। খেয়ে না খেয়ে হাজার হাজার লোক রাত-দিন সেখানেই অবস্থান করছে। সেখানে তাদের রাত্রি যাপন ও ছালাত আদায়ের দৃশ্য মিডিয়ায় প্রকাশ পেয়েছে। অধীর আগ্রহে তারা অপেক্ষায় রয়েছে কখন মোবারক ক্ষমতা ছাড়বে আর নতুন কোন জনমতের সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের আশা-আকাংখা পূরণ করবে– এ দৃশ্যই বাস্তব ছিল গত ১৭ দিন সারা মিসরে। এরূপ অগ্নিমুখর পরিবেশে ১০ ফেব্রুয়ারী রাতে প্রেসিডেন্ট হোসনী মুবারক জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন এবং সেখানেই ক্ষমতা ছাড়ার ঘোষণা দিতে পারেন বলে জোর গুজব উঠে। কিন্তু সকলকে হতাশ করে তিনি ক্ষমতা না ছাড়ার কথা জোরালোভাবে পুনর্ব্যক্ত করলে আবার ক্ষোভে ফেটে পড়ে মিসরবাসী। নতুন করে ডাক দেয়া হয় ২ কোটি লোক জমায়েতের। বিদ্রোহের প্রস্তুতি নতুনভাবে শুরু হলে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে পরদিনই ১১ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন থেকে ঘোষণা আসে হোসনী মোবারক সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করে পদত্যাগ করেছেন। এভাবেই মিসরের ৩০ বছরের শাসনকর্তা ক্ষমতাধর এক স্বৈর শাসকের পতনঘণ্টা বেজে যায়।

কেন এই গণবিদ্রোহ : গণঅসন্তোষ থেকেই উৎপত্তি হয় গণবিদ্রোহের। মানুষ স্বভাবতই বৈষম্য সহ্য করে না। কেউ থাকবে পাঁচতলায়, কেউ থাকবে গাছতলায়, কেউ খাবার নষ্ট করবে আর কেউ খেতে পাবে না–এতো হতে পারে না।

তিউনিসিয়ার মত মিসরের গণঅসন্তোষেরও সূত্রপাত হয় ধনী-গরীবের এই বৈষম্য ও শিক্ষিত যুবশ্রেণীর বেকারত্ব থেকে। মিসরের মাথা পিছু আয় ২২২০ ডলার যার বড় অংশই আসে তেল, গ্যাস, তুলা, সুয়েজ খাল ও পর্যটন থেকে। বস্ত্রখাতের উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি টেলিযোগাযোগের মত সেবা খাতেরও অবদান রয়েছে মিসরে। অর্থনীতির এই আয়ের উৎসগুলো ক্ষমতাবান রাজনৈতিক এলিটদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ায় দেশটির জনগোষ্ঠির মাঝে দরিদ্রতার ব্যাপকতা লক্ষ্যণীয়। কায়রোর ব্যাপক অংশজুড়েই রয়েছে ডেডসিটি বা মৃতদের শহর। মৃতদের জন্য তৈরী করা এই শহরের কবরগুলোতে বাস করেন হাজার হাজার মিসরী। যাদের এখানে থাকার বিনিময়ে কোন ভাড়া দেয়া লাগেনা। কিন্তু এদের একবেলা খাবার সংগ্রহ করাই কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ এদের অদূরে নীলনদের জলরাশির উপর প্রতিদিন রিভারক্রুজে আয়োজন থাকে ব্যালে নৃত্য অনুষ্ঠানের। দারিদ্র আর বিলাসিতা এভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় মিসরে শ্রেণীবৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছে। এদেশের সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী দারিদ্রতার হার ২০ শতাংশ এবং প্রতি ৩ জনে ১ জন বেকার। যে সব যুবকদের গড় বয়স ১৫- ২৯ বছর, ২০০৯ সালে তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার ছিল ৩২ শতাংশ। এদের মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক বেশী। অন্যদিকে দীর্ঘদিন একই সরকার ক্ষমতায় থাকায় প্রশাসনের বিভিন্ন সেক্টর দুর্নীতির অভয়াশ্রমে পরিণত হয়েছে।

দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত, দুর্নীতির বেড়াজালে আবদ্ধ ও বেকারত্বের অভিশাপে পিষ্ট তরুণ সমাজের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল। তাই এবার তারা গা ঝাড়া দিয়ে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় ক্ষমতাবান শাসকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের এই বিদ্রোহই পরিশেষে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতামঞ্চকে এক চরম ভূমিকম্পে ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম ব্রাদারহুড, আতঙ্কে ইসরাইল : Muslim Brotherhood যার মূল নাম হচ্ছে اخوان المسلمين। আরব ও আফ্রিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল। হোসনি মোবারকের পতনের জন্য যে ২৯টি সংগঠন মিলে `Rainbow coalition' বা রংধনু কোয়ালিশন গঠন করা হয় তার অন্যতম হচ্ছে Muslem brotherhoad। ১৯২৮ সালে হাসান আল-বান্না দলটির প্রতিষ্ঠাদান করেন। তিনি স্বতন্ত্রভাবে ইসলামের মূল দাওয়াতী কর্মসূচীর পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে দলটিকে আরব বিশ্বে জনপ্রিয় শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে এই দলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই দলের দাওয়াত ও জিহাদের বিপ্লবী মন্ত্রে মিসরে যে তুমুল জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ভীত হয়ে তৎকালীন সরকার ১৯৪৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী হাসান আল-বান্নাকে ফাঁসিতে ঝুলায়। উল্লেখ্য যে, ঠিক সেদিনই রাজশাহীর নওদাপাড়ায় আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাষণে সেইদিন ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলন্ত বান্নার কণ্ঠই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। এ যেন এক বান্নার মৃত্যুতে শত বান্নার উত্থান। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে দলটির পরবর্তী আপোষহীন নেতা সাইয়েদ কুতুবসহ মোট ৬ জনকে ফাঁসি দেয়া হয় এবং দলটিকে নিষিদ্ধ করা হয়। এরপরেও দলটির বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে কোন ভাটা পড়েনি যার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে। এই যুদ্ধে ইখওয়ানের স্বেচ্ছাসেবকরা প্রশিক্ষিত সৈনিকদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি দৃঢ়তা ও বীরত্ব দেখিয়েছে। যা সারা আরবে বাহবা কুড়াতে সক্ষম হয়েছিল। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ১৯৮০ সালের দিকে নেতৃত্বের পরিবর্তনের কারণে দলটি তার প্যান-ইসলামিক আদর্শ থেকে পিছু হটে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দলের সাথে আপোষ করে। দলটির এই আপোষকামী মনোভার এর জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। অনমনীয় দৃঢ়তা ও অটল আদর্শ দ্বারা দলটি যে আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সারা আরবে, আপোষকামী হওয়াতে সে জনপ্রিয়তায় অনেক ভাটা পড়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে দলটি তার নিজ আদর্শে অটল থাকলে মিসরসহ মধ্যপ্রাচ্য একক রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হত। জনগণই তাদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিত।

যাইহোক দলটির জনসমর্থন কমলেও বর্তমান মিসরে এই দলটির চেয়ে সুসংগঠিত কোন দল নেই। গণবিপ্লব শুরু হওয়ার পর দলটি পুনরায় ব্যাপক আলোচনায় এসেছে। বিশেষত চলমান বিদ্রোহকে সুসংগঠিত লক্ষ্যে পরিচালনায় তাদের অবদানই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে দেশটির রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্নে ইখওয়ানের নামই সবার আগে আসছে। রংধনু কোয়ালিশনের নেতা এল বারাদী যুক্তরাষ্ট্রের এবিসি টিভিতে দেয়া সাক্ষাৎকারে ইখওয়ানের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে বারাদিকে সামনে রেখে ইখওয়ান এগিয়ে যেতে চাচ্ছে। অন্যদিকে তিউনিসিয়ায় বিদ্রোহে 'আল-নাহাদ' নামে যে দলটি নেতৃত্বে ছিল তার আদর্শ ও ইখওয়ানের আদর্শ অভিন্ন। দলটির নেতা রশিদ ঘানৌচা এক সময় ইখওয়ানের সাথে জড়িত ছিলেন।

জর্ডানের প্রধান বিরোধী দল মুসলিম ব্রাদারহুড সে দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ করেছে। জর্ডানের বাদশাহ তার মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়েছেন এবং নতুন প্রধানমন্ত্রীকে সংস্কার আনার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও ব্রাদারহুডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী সংস্কারের উপযুক্ত নন। সুদানের মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা ড: হাসান তুরাবী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিলে প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশীর তাকে আবারও গ্রেফতার করেন।

এদিকে মিসরে মোবারক সরকারের পতনে এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের নবতর উত্থানে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ইসরায়েল। কারণ মিসরের সাথে রয়েছে ইসরায়েলের দীর্ঘ সীমান্ত সংযোগ, রয়েছে মিসরের সাথে গাজার স্থল যোগাযোগের বিখ্যাত রাফা ক্রসিং। এই ক্রসিং দিয়েই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যা যায়, গাজার ফিলিস্তিনিরা তাই খেয়ে জীবন ধারণ করে। আর যেহেতু মোবারক মার্কা দালাল সরকারের গাদ্দারীতেই মিসর ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে ইসরাইলের সাথে প্রথম মুসলিম দেশ হিসেবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এজন্য এ রকম সরকার ইসরাঈলের অস্তিত্ব রক্ষার্থে খুবই প্রয়োজন। এসব কারণে ব্রাদারহুড বা তার সমমনা কোন দলের ক্ষমতাগ্রহণ ইসরায়েলের জন্য হবে বড় দুঃসংবাদ। কেননা ইসরায়েলের সাথে যদি সম্পর্কও রাখে তবুও তারা মোবারক সরকারের মত এতটা আনুগত্য হয়ত দেখাবে না।

মিসরের ভবিষ্যৎ : হোসনী মোবারক এই ব্রাদারহুড জুজু দেখিয়েই আমেরিকা-ইসরাঈলসহ অন্যান্য দেশের সমর্থন পেতে চাইছিলেন। তাই গত ৩ ফেব্রয়ারী এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, তিনি পদত্যাগ করলে ইসলামপন্থীরাই লাভবান হবে। একই সাক্ষাৎকারে ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলায়মানও বলেন যে, 'মিসরের জনগণ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সাথে পরিচিত নয়। কিছু ইসলামপন্থী মিসরবাসীকে উস্কানী দিয়ে বিদ্রোহে নামিয়েছে।' এসব নানা বিবেচনা ও হিসাব কষাকষি করে বিদ্রোহের প্রথমদিকে সঊদী আরব ও আমেরিকা প্রকাশ্যে মোবারকের পক্ষাবলম্বন করে। কিন্তু মিসরের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণকালের ভয়াবহতম এই বিদ্রোহের তীব্রতা দেখার পর তারা সুর পাল্টাতে শুরু করে। মিসরীয় সেনাবাহিনীও শুরু থেকেই জনগণের বিদ্রোহে মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করে। এমনকি মিডিয়াতে সৈন্যদের ট্যাংকে চড়ে জনতাকে উল্লাস করতে দেখা গিয়েছিল। ফলে সঠিক পরিস্থিতি বিবেচনায় মোবারকের পতন ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। তবে মোবারকের পতনের পর বর্তমানে এই প্রশ্নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, মোবারকের পতনের পর এখন ক্ষমতার মসনদ কার করতলগত হবে? এখনি কোন আমেরিকা-ইসরাঈল সমর্থিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, নাকি তিউনিসিয়ার মত রাজনৈতিক অচলাবস্থা দেখা দিবে? এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে কোন কিছুই বলার উপায় নেই। তবে আমেরিকা ও মিসরীয় সেনাবাহিনী চেয়েছিল মোবারককে সম্মানজনকভাবে বিদায় করতে। এজন্য তারা মোবারককে আরো কিছুদিন সময় দিয়ে আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের মাধ্যমে বিদায় দিতে চাচ্ছিল। তাদের এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণ হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে তারা মিডিয়ার মাধ্যমে এমন একজনকে সামনে আনবে যে মোবারকের মত তাদের অনুগত থাকবে। আর এই অঞ্চলে কেউ যদি ক্ষমতায় থাকতে চায় তাহলে তাকে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীদের সাথে গাঁটছাড়া বেঁধেই থাকতে হয়। এক্ষেত্রেও এমনটি ঘটার সম্ভাবনাই বেশি।

তারপরও অবশ্য বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে যা হচ্ছে এতে আমেরিকার চেয়ে ইরান-তুরস্ক জোনের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইরান সমর্থিত হিযবুল্লাহ একক চেষ্টায় লেবাননের পশ্চিম সমর্থিত সরকারের পতন ঘটিয়ে নতুন সরকার গঠনের দায়িত্ব নিজেই নিয়েছে। এক্ষেত্রে আমেরিকার দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া কোন উপায় নেই। মিসর ও মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থাদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে বিশাল এক আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে ক্রমবর্ধিষ্ণু গণবিক্ষোভে নিছক বিবৃতিদাতা ও দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে আমেরিকা।

অন্যদিকে সমস্যা হচ্ছে আকস্মিক সংঘটিত এই বিপ্লবের এখন পর্যন্ত কোন নেতাকে পাওয়া যায়নি যার প্রভাব অধিকাংশ জনগণের উপরে রয়েছে বা এমন কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলও নেই যারা বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেবে। সংগঠিত দল বলতে রয়েছে ঐ ব্রাদারহুডই। তবে ব্রাদারহুডকে যতটা সক্রিয় ও প্রভাবশালী ভাবা হচ্ছে বাস্তবে ততটা না। মিসরের মাত্র ২০ শতাংশ তাদের সমর্থন করে। তাই ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক ব্রাদারহুডের ক্ষমতা গ্রহণের সম্ভবনাকে অমূলক বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি এটাকে হোসনী মোবারকের দুর্নীতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ, ধনী-গরীব, ধর্মভীরু, ধর্মহীন সকলের সম্মিলিত বিপ্লব হিসেবে দেখছেন। কায়রোর তাহরীর স্কয়ারে সমাবেত জনতার সামনে জুম'আর ছালাতের ইমাম যে খুৎবা দিয়েছেন তাতেও ইসলামী শাসনতন্ত্র নয় বরং সাধারণ গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথাই স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় মোবারকের স্থলে যিনি ক্ষমতায় আসছেন তিনিও মোবারকের চেয়ে তেমন ভিন্নতর কিছু হবেন না। ফলে গতানুগতিক শাসক পরিবর্তনের দৃশ্যই হয়ত আবার দেখা যাবে আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নতুন কোন তাজা রক্তের দালাল আসবে দৃশ্যপটে। বিপ্লবীরা আবার ফিরে যাবে নৈমিত্তিক জীবনে, নিপীড়িত জনতার কাতারে।

সবমিলিয়ে যেটি বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, মিসরের ঘটনা প্রবাহ দ্রুত একটি পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। রঙ্গমঞ্চে মোবারক, আল-বারাদি, ওমর সোলায়মান, ব্রাদারহুড, মিসরীয় সেনাবাহিনী ও বিপ্লবী জনতা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র। কিন্তু সকলেই দুর্নিবার এক টানে অজানা কোন এক ক্লাইম্যাক্সের পানে ছুটে চলেছে। শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনাপূর্ণ পট পরিবর্তন দৃশ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে; সমঝোতা না সংঘাত, ব্রাদারহুডের উত্থান না মার্কিনী প্রভাবভুক্ত বলয়ের পুনরাবির্ভাব– আগামী কিছুদিন সারাবিশ্ব তাকিয়ে থাকবে সেদিকেই।

আমেরিকার চেহারা আরেকবার উন্মোচন : মধ্যপ্রাচ্যের এই বিপুল ডামাডোলে বরাবরের মত আমেরিকা সাধুর বেশে বহুল

কথিত গণতন্ত্রের বোল নিয়ে হাজির। সারা বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সোল এজেন্ট তারা। কেননা জনগণের মতামতকে নাকি তারাই সবচেয়ে শ্রদ্ধা করে। কথা মিথ্যা নয়। ইন্দোনেশিয়া থেকে পূর্ব তিমুরকে পৃথক করার সময় তাদের কাছে কতিপয় খৃষ্টান অধিবাসীর মতামত ১০নং মহাবিপদ সংকেতের ন্যায় গুরুত্ব পায়। সম্প্রতি খৃষ্টান অধ্যুষিত দক্ষিণ সুদানের জনমত তাদের কাছে বিরাট মূল্য বহন করেছে। কিন্তু হায়! পূর্ব তিমুর ও দক্ষিণ সুদানের বহু পূর্বকাল থেকে কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, মিন্দানাও, ইরিত্রিয়া, ককেশাশ, চেচনিয়া প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে একটি গণভোট পর্যন্ত তারা আয়োজন করতে পারেনি। সেখানে সামরিক হস্তক্ষেপ তো বহু দুরস্ত। তাই তো রবার্ট ফিস্ককে বলতে শুনি, 'আমরা গণতন্ত্রে পরিণত করতে চাই, অথচ করছি উল্টাটা। আমরাই এই সমস্ত স্বৈর শাসকদেরকে টিকিয়ে রেখেছি'।

আসলে আমেরিকার মূল লক্ষ্য, যে কোন মূল্যে নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা। এই স্বার্থের জন্যই তারা কখনও গণতন্ত্রের বুলি কপচায় আবার সময়ে সুর পাল্টিয়ে নানা কথায় বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এই সেই গণতন্ত্রপন্থী আমেরিকা যে দেশটি ফিলিস্তিনী নির্বাচনে হামাস বিজয়ী হলেও তাদেরকে সরকার পরিচালনা করতে দেয়নি। আলজেরিয়াতে ইসলামিক স্যালভ্যাশন ফ্রন্ট বিপুল ভোটে বিজয়ী হলেও পশ্চিমা দেশগুলো সামরিক শাসক আব্দুল আযীয বুতেফলিকাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। তুরস্কেও তারা একই চেষ্টা করেছিল কিন্তু সফল হয়নি। সম্প্রতি ইরানের বিদ্রোহে ইন্ধন যুগিয়েছে। এভাবেই বিশ্ব মোড়লের ধ্বজাধারী আমেরিকা তার আসল চেহারা নিয়মিত উন্মোচন করে চলেছে।

ফিরে দেখা ও ইতিহাসের শিক্ষা : আজ যে মিসরে মোবারকের গদিতে বিদ্রোহের আগুনে জ্বলেছে এই মিসরেরই এক সময় শাসনকর্তা ছিলেন হযরত ইউসুফ (আঃ)। এখানেই দাপটের সাথে দীর্ঘদিন রাজত্ব পরিচালনা করেছে নিজেকে প্রভু বলে দাবীকারী ফেরাউন। তারই রাজপ্রাসাদে ও মিসরের আলো-বাতাসে বড় হয়েছেন ঈসা (আঃ)। ফেরাউন কর্তৃক নিহত হাজারো শিশুর রক্ত মিসরের মাটিতে মিশে আছে। এখানেই আছে আছিয়ার ন্যায় ঈমানী পর্বতের শাহাদাত কবুলের স্থান, নদীতে ডুবন্ত ফেরাউন ও বিজিত বনী ইসরাঈল মিসরের ইতিহাসের এক অনবদ্য চিত্রনাট্য। এই মাটিতেই রোমক বাহিনীকে পরাজিত করে ইসলামের বিজয় নিশান উড্ডীন করেন ওমর (রাঃ)-এর সেনাপতি আমর ইবনুল আস (রাঃ)। এই মিসরের মাটি থেকেই পরিচালিত হয়েছিল স্মরণকালের ভয়াবহ যুদ্ধ, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সালাহুদ্দীনের বজ্র নিনাদ। কিন্তু তারা আজ কেউ বেঁচে নেই। সবাই শুধু কালের সাক্ষী, পৃথিবীর শুরু থেকে মহাকালের যে যাত্রা শুরু হয়েছে তার গর্ভে হারিয়ে গেছে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার দাপট, বিজয়ের উল্লাস ও পরাজয়ের বেদনা। আজকেও যারা ক্ষমতার মোহে মদমত্ত তারাও একদিন হারিয়ে যাবে মহাকালের গর্ভে। এই দুনিয়াতে রাজত্ব এবং ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে– মানবজাতিকে এই শিক্ষাটি দেওয়ার জন্যই আল্লাহ মিসরের বুকে আজও অক্ষত রেখেছেন সাড়ে তিন হাজার বছর আগের ফেরাউনের লাশ। অথচ এই মিসরের শাসকরা পর্যন্ত এখান থেকে শিক্ষা নিল না। আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন সূরা ইমরানের ২৪ নং আয়াতে- قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'হে নবী আপনি বলে দিন আল্লাহই হচ্ছেন সকল রাজ্যের রাজা। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দাও, যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নাও। তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করো এবং যাকে ইচ্ছা অপমাণিত কর। তোমার হাতেই রয়েছে কল্যাণের চাবিকাঠি। তুমি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান'। সুতরাং এটাই বাস্তব যিনি জেলখানা থেকে নবীকে মন্ত্রী বানাতে পারেন, যেই আল্লাহ প্রভুত্বের দাবীদার ফেরাউনকে পানিতে ডুবাতে পারেন, তিনি চাইলে মোবারককের স্থলে ব্রাদারহুডকে আনতে পারেন। এখানে জনগণ, সেনাবাহিনী, মার্কিনীরা উপলক্ষ্য মাত্র। আরও এটি কথা না বললেই নয়, তিউনিসিয়া বা মিসরের অভূতপূর্ব, অপ্রত্যাশিত এই ঘটনার ফলাফল আর যাই হোক না কেন, তা আরব জাহানের অন্যান্য বাদশাহদের টনক নড়িয়ে দিয়েছে। আলজেরিয়া ও ইয়েমেনেও একই আকারের বিদ্রোহ শুরু হতে আর দেরী নেই। এসব দেশে বিপ্লবীদের মূল দাবী দারিদ্র্যমুক্তি, বেকারত্ব, সুশাসন-শৃংখলা যদি নাও ফিরে আসে তবুও এই বিপ্লব আরব বাদশাহদের কাছে এক কঠিন সতর্কবার্তা ইতিমধ্যেই পোঁছে দিয়েছে যে, যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা ও নিজ আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন নিয়ে দেশকে শুষে খাওয়ার দিন শেষ হয়ে আসছে। স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ আগের মত আর অবারিত থাকছে না। বিপ্লবের সাফল্য যদি এতটুকুতেই থেমে যায় তবুও তা কম কিসে! সত্যি সত্যিই আরব বাদশাহদের মাঝে এই বোধোদয়ের জন্ম হলে হয়ত মধ্যপ্রাচ্যে আবার এক নতুন যুগের সূচনা ঘটবে। তবে নতুন এক আশংকার কথাও অবশ্য উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতি বিনির্মাণে সহায়তাকারী এক ওয়েবসাইটে সম্প্রতি বলা হয়েছে, আগামী কিছুদিনের মাঝেই আরব বিশ্ব ৪০টি দেশে বিভক্ত হবে। যার শুরু হয়েছে সুদানকে বিভক্তির মাধ্যমে। তাই এসব ঘটনার আড়ালে আমেরিকা-ইসরাঈল আবার নতুন কোন চাল খেলছে না তো! আপাতত সে উত্তর আমাদের জানা নেই। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে হেফাযত করুন এবং মুসলিম শাসকদেরকে এথেকে শিক্ষা গ্রহণ ও আত্মোপলব্ধির তাওফীক দান করুন। আমীন!!

তাওহীদের মূল সূত্রাবলী : আবূ আমিনা বিলাল ফিলিপস

- নূরুল ইসলাম

লেখকের জীবনী : ড. আবূ আমিনা বিলাল ফিলিপস ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেশ জ্যামাইকার কিংস্টন নগরীতে এক খৃষ্টান যাজক পরিবারে ১৯৪৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল ডেনিস ব্রেডলি ফিলিপস। মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি তাঁর পরিবারের সাথে কানাডায় চলে আসেন। কানাডা থেকে বিলাল ফিলিপসের পরিবার মালয়েশিয়ায় স্থানান্তরিত হলে তিনি এই প্রথম মুসলিম সমাজের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন। সেখানে গান-বাদ্যের সাথে জড়িয়ে পড়লে বাবা-মা সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তা করে তাঁকে কানাডার সিমন ফ্রেশিয়ার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। সমাজতন্ত্রের পাঁড় সমর্থক হিসেবে এটিকে মানবজাতির মুক্তির উপায় হিসেবে ভাবতে থাকেন। কিন্তু ক্রমেই তার কল্পনা জগতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হতে লাগল। তাঁর কাছে মনে হল, সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের কোন নৈতিক ভিত্তি নেই। এরপর ক্রমেই তিনি ইসলাম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে থাকেন। বিলাল ফিলিপস বলেন, 'কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিমদের একটি উপাসনালয় পরিদর্শনে যাওয়ার পর তাদের সংগঠন ও নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যবেক্ষণ করে আমার মনে এতই দাগ কাটে যে, আমার নিকটে আমাদের নিজেদের তথাকথিত আদর্শবাদকে বড়ই ভিত্তিহীন বলে মনে হল'।

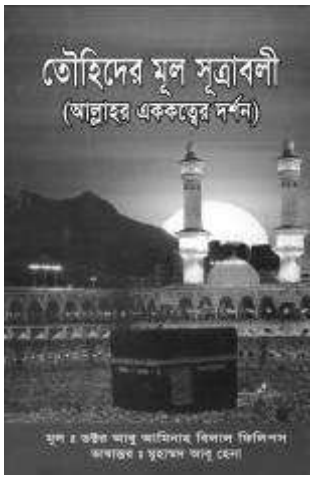

চীনের এক কমিউনিস্ট নেত্রী ইসলাম গ্রহণ করলে বিলাল ফিলিপস তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন। তাকে কোন জিনিস এতে উদ্বুদ্ধ করেছিল- তা জানার জন্য তিনি ইসলাম ধর্ম বিষয়ক বই-পত্র অধ্যয়ন করতে মনস্থ করেন। ইত্যবসরে ১৯৭১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং বিলালকে মুহাম্মাদ আসাদ রচিত Islam : The Misunderstood Religion গ্রন্থটি পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। এটি এবং Towards Understanding Islam গ্রন্থটি তাঁকে ইসলামের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। প্রথম বইটি পড়ে তিনি অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন যে, মানব সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামই সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান। সে সময় সূরা রা'দের ১১নং আয়াতটিও তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সেখানে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ ততক্ষণ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে'। অবশেষে তিনি সব দ্বিধাদ্বন্দ্বের চাদর ছুঁড়ে ফেলে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারীতে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরপর তিনি টরেন্টোতে গিয়ে কুরআন তেলাওয়াত শিখেন।

১৯৭৩ সালে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। প্রথম দু'বছর তিনি ভাষা ইনস্টিটিউটে আরবী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিসান্স ডিগ্রি অর্জন করে মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য রিয়াদের কিং সঊদ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। ১৯৮৫ সালে তিনি ইসলামী আক্বীদায় মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। সঊদীতে অবস্থানকালীন তিনি মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা করেন। উপসাগরীয় যুদ্ধ চলাকালে আমেরিকান সৈন্যদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ দূরীকরণে দাওয়াতী প্রোগ্রাম আঞ্জাম দেন। তাঁর প্রচেষ্টায় তিন হাযারের অধিক আমেরিকান সৈন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর নও মুসলিমদের ছালাত আদায়ের জন্য ইমাম নিয়োগের ব্যাপারে তিনি কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। সঊদী আরব থেকে তিনি ফিলিপাইনে সফর করেন। মিন্দানাও দ্বীপে শিক্ষার ইসলামীকরণ বিষয়ে তাঁর বক্তৃতার ফলশ্রুতিতে Sharif Kabunsuan Islamic University প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে তিনি তিন বছর অধ্যাপনা করেন। ১৯৯৪ সালে তিনি ওয়েলস ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামী ধর্মতত্ত্বে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি আরব আমিরাতের কারামা নগরীতে 'ইসলামিক ইনফরমেশন সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করেন। এ সেন্টারের প্রচেষ্টায় অনেক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ১৯৯৪ সালে তার বাবা-মাও ইসলাম গ্রহণ করেন। ২০০১ সালে তিনি অনলাইন ইসলামিক ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ডা. জাকির নায়েকের পীস টিভির অন্যতম আলোচক।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- The Foundation of Islamic Culture, The Purpose of Creation, The True Religion of God, Seven Habits of Truly Successful People, The Moral Foundation of Islamic Civilizations. তাঁর রচিত The Fundamentals of Tawheed গ্রন্থটি 'তাওহীদের মূল সূত্রাবলী' শিরোনামে সম্প্রতি বাংলা ভাষায় কয়েকটি প্রকাশনী থেকে অনূদিত হয়েছে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ এই বইটির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হল।

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় তাওহীদের গুরুত্ব সর্বাধিক। তাওহীদের স্বীকৃতি দান ও তাওহীদের দাবীকে প্রতিষ্ঠাদানের জন্যই আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন অসংখ্য নবী ও রাসূল। আল্লাহকে একক ও সার্বভৌম স্রষ্টা বলে স্বীকার করা এবং ইবাদত ও আমলে একমাত্র তাঁর প্রদত্ত শরী'আতের

অনুসরণ করাই তাওহীদের মূলকথা বা সারনির্যাস। তাওহীদের বিপরীত বিষয়টি হল শিরক; যা থেকে উৎপন্ন হয় আল্লাহকে একক স্রষ্টা হিসাবে স্বীকার না করা বা তাঁর শরী'আতকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ না করা প্রভৃতি গর্হিত অপরাধ। এজন্য তাওহীদ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে তাওহীদের প্রতিবন্ধক তথা শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনাও ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। অথচ শয়তানের খপ্পরে পড়ে ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে খোদ মুসলিমরাই জ্ঞাতসারে বা অবচেতনভাবে শিরকের মতো ভয়াবহ অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে অবলীলায়। সেকারণ তাওহীদের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করানোর জন্য আরবীসহ বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আবার যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শিরকের নিত্য-নতুন আকৃতি-প্রকৃতির উদ্ভাবন ঘটায় এ বিষয়ক বইও নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে রচনা করতে হয়েছে। এমনই একটি বই ড. ফিলিপসের The Fundamentals of Tawheed গ্রন্থটি। ইবনু আবিল ইযয হানাফীর 'শারহুল আক্বীদা আত-তাহাবিয়াহ' অবলম্বনে রচিত এই গ্রন্থটি ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মীয়, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলোর মৌলিক বিরোধস্থল থেকে একটি চমকপ্রদ পর্যবেক্ষণমূলক রচনা। তাওহীদ বিষয়ক এরূপ বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায়তো বটেই আরবীসহ অন্যান্য ভাষাতেও সুলভ নয়।

১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত পুস্তিকাটির ভূমিকায় মু'তাযিলা সম্প্রদায়, সূফী পণ্ডিত ইবনুল আরাবী (১১৬৫-১২৪০ খৃঃ) প্রমুখ ব্যক্তি ও বিভ্রান্ত খারেজী ফেরকাসমূহের উদাহরণ টেনে লেখক খোদ মুসলমানদের মধ্যেই যে তাওহীদের ব্যাপারে সঠিক ধারণার প্রচুর অভাব রয়েছে তা স্পষ্ট করেছেন। তাঁর মতে, পৃথিবীর তাবৎ ঈশ্বরবাদী ধর্ম থেকে ইসলামের তাওহীদী দর্শনের যে পার্থক্য তা-ই ইসলামকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছে। যদি তাওহীদ কারো মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত না থাকে তাহলে তার যাবতীয় ইবাদত নিছক পৌত্তলিক ধর্মীয় আচারে পরিণত হয়। আর তাই ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য যারা ষড়যন্ত্র করেছে তারা প্রধানত ইসলামের তাওহীদী তত্ত্বকে নিষ্ক্রিয় করার প্রয়াস চালিয়েছে। যাতে মানুষ নিজের অজান্তে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো উপাসনা করে এই ভেবে যে, তারা মূলত আল্লাহ্রই ইবাদত করছে। এসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে লেখক বইটি রচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি নিজে প্রাক্তন অমুসলিম হওয়ায় তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা যে বইটির পরিপুষ্টি সাধনে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছে তা বলাই বাহুল্য।

প্রথম অধ্যায়ে তাওহীদের অর্থ ও তিনটি প্রকারের নাতিদীর্ঘ অথচ খুব সহজভাবে বোধগম্য আলোচনা করেছেন। বাইবেল ও শী'আদের বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি তুলে ধরে তিনি তাওহীদ সম্পর্কে বিভ্রান্তির আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণসমূহ উদ্ঘাটনের প্রয়াস চালিয়েছেন। ক্ষেত্র বিশেষে নিজের বক্তব্য তুলে ধরে তাওহীদী দর্শনের সমসাময়িক প্রয়োগে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তাওহীদে ইবাদাত সম্পর্কিত আলোচনাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'তাওহীদে ইবাদাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল শরী'আহ বাস্তবায়ন। শরী'আহ্ ভিত্তিক আইনের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ আইন বাস্তবায়ন নিশ্চয়ই আল্লাহ্র আইনের প্রতি অবিশ্বাস এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার পর্যায়ে পড়ে। এরূপ বিশ্বাস আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের উপাসনা করার নামান্তর তথা শিরক। যদি শরী'আহ বাস্তবায়নের ক্ষমতা না থাকে তবে তা বাস্তবায়নের জন্য সোচ্চার কণ্ঠ থাকা উচিৎ। যদি এটাও না সম্ভব হয় তবে কমপক্ষে অনৈসলামিক সরকারকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে হবে'।

২য় অধ্যায়ে তাওহীদের বিপরীত তথা শিরক সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর মতে, শিরক জঘন্যতম পাপ হওয়ার কারণ হল, শিরক মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকেই অস্বীকার করে। পুরো অধ্যায়ে শিরকের নানা খুঁটিনাটি বিষয় প্রাচীন ও চলমান বিশ্বের নানা ঈশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদীদের ধর্ম-দর্শন এবং উপজাতীয়দের নানা আচার-বিশ্বাসের আয়নায় উপস্থাপন করে তিনি এক তথ্যবহুল আলোচনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। স্পষ্টভাবে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে সূফী ও শী'আ মতাবলম্বীরা ইসলামের দাবী নিয়েও শিরকের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেখিয়েছেন কীভাবে মেইনল্যান্ডার, নিট্শে, জ্য পল সার্ত্রের মত বিখ্যাত দার্শনিকরা, ডারউইন, আইনস্টাইনের মত বৈজ্ঞানিকরা যুক্তি ও পাণ্ডিত্যের বাতাবরণে মানুষকে শিরকের আবর্জনায় প্রতিনিয়ত নিক্ষেপ করে চলেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, 'আইনস্টাইনের বহুল পঠিত আপেক্ষিক তত্ত্ব (E=mc2, শক্তি সমান ভর গুণন আলোর গতির বর্গফল) প্রকৃতপক্ষে তাওহীদে আসমা ওয়াস সিফাতের অন্তর্ভুক্ত শিরকের অভিব্যক্তি। কেননা এ তত্ত্ব মতে, পদার্থ ও শক্তি চিরন্তন। এর কোন আদি ও অন্ত নেই। অথচ এ গুণটি কেবলমাত্র আল্লাহ্র।

৩য় অধ্যায়ে বারযাখ, প্রাকসৃষ্টি, ফিতরাত, মানুষের কাছে আল্লাহ্র অঙ্গীকার প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক তাওহীদী আক্বীদা উল্লেখ করত এসকল বিষয়ে যেসব শিরকী কুসংস্কার ও বিশ্বাসের প্রচলন রয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন। যে সকল মুসলমান না জেনে না বুঝে নিতান্ত মূর্খের মত শিরকী কাজকে ভাল কাজ বলে মনে করে তাদের প্রতি সক্ষেদে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে ড. ফিলিপস বলেন, 'তারা কি শুধু ঘটনাচক্রে মুসলমান নাকি পছন্দের দ্বারা মুসলমান? ইসলাম কি তাই যা তাদের পিতামাতা, গোষ্ঠী, দেশ অথবা জাতি যা করেছিল? নাকি ইসলাম তাই যা কোরআন শিক্ষা দেয় এবং রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবাগণ যা করেছিলেন?'।

৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে যাদু, যাদুমন্ত্র, শুভ-অশুভ আলামত, ভাগ্য গণনা, জ্যোতিষশাস্ত্র, রাশিচক্র এবং এসবের প্রাচীন-আধুনিক সব সংস্করণ ইত্যাদি হাজারো কল্পনাপ্রসূত ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার ও জাহেলী চিন্তাধারা সম্পর্কে লেখক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যা একজন মুসলিমের জন্য জানা অপরিহার্য। তিনি বলেন, এ সকল চিন্তা শিরকযুক্ত হওয়ার কারণ হল এগুলো তাওহীদে আসমা ওয়াস সিফাত (আল্লাহ্র গুণাবলীতে একত্ববাদ)-এর ভিত্তি গুড়িয়ে দেয়। কেননা এসব প্রথা- (১) ইবাদতের প্রক্রিয়া অর্থাৎ যাকে তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্র উপর নির্ভরতা) বলা হয় তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দিকে পরিচালিত করে এবং (২) ভালো-মন্দ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং আল্লাহ প্রদত্ত তাক্বদীর এড়ানোর ক্ষমতা মানুষের বা অন্য কোন সৃষ্টিজীবের উপর অর্পণ করে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে

এসব প্রথার নানাবিধ আকৃতি-প্রকৃতি দেখা গেলেও সবগুলোর উৎপত্তিস্থল একই গোড়ায় মূলীভূত যার নাম শিরক। বিশ্বাসের গভীরতম প্রদেশে যখন শিরকের এই শিকড় গজিয়ে ওঠে তখন আল্লাহ্র এককত্বে বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। শয়তানী ও পাশবিক শক্তির তাণ্ডবে সেখান থেকে ঈমানের আলো হয়ে পড়ে অপসৃত। এজন্য যে কোন মূল্যে শিরকের যাবতীয় উপলক্ষ্য থেকে আত্মরক্ষা করা একজন প্রকৃত মুসলিমের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

৮ম অধ্যায়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরিচয় সম্পর্কে মানব সমাজে বিদ্যমান কতিপয় বিভ্রান্তি নিয়ে লেখক এক দলীলসমৃদ্ধ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেছেন। মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি ভ্রান্ত ধারণা হল– 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান' (ওয়াহদাতুল উজূদ)। যা মূলত ব্রহ্মা সর্বত্র বিরাজমান– এই হিন্দু মতবাদ থেকে শুরু হয়। পরে তা খৃষ্টীয় বিশ্বাসে আশ্রয় লাভ করে ভারতবর্ষ, পারস্য ও গ্রীক অঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। যা পরবর্তীতে সূফী মরমীগোষ্ঠীর মাধ্যমে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। তাওহীদে আসমা ওয়াস সিফাতকে ক্ষুণ্নকারী এই বিশ্বাসের মাধ্যমে আকাশ-যমীনের যাবতীয় কিছুকে আল্লাহ্র অংশ কল্পনা করে জঘন্যতম শিরকে লিপ্ত হয়েছে পথহারা মানুষ। আল্লাহ্র অসীমত্ব সাব্যস্ত করতে যেয়ে আকারহীন, নির্গুণ, নিশ্চল সত্তায় পরিণত করে সৃষ্টির মাঝেই তাঁর বহিঃপ্রকাশ সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। লেখক এ ব্যাপারে বিস্তারিত দলীলাদি পেশ করার পর উপসংহার টেনেছেন এই বলে– আল্লাহ্র সঠিক পরিচয় হল তিনি (১) তাঁর সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। (২) কোন সৃষ্টি তাঁকে বেষ্টন করে নেই বা তাঁর উর্ধ্বে বিরাজমান নেই। (৩) আল্লাহ সকল বস্তুর উর্ধ্বে।

৯ম অধ্যায়ে আল্লাহ্র দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহকে কোন দৃশ্যমান আকৃতিতে এই পার্থিব জীবনে দেখা সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন ধর্মে স্রষ্টার প্রতিকৃতি নির্মাণের প্রথা নিতান্তই জাহেলিয়াত। পরকালীন জীবনেই কেবল মুমিন বান্দাদের পক্ষে আল্লাহ্র সাক্ষাৎলাভ সম্ভব– এটাই এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য। এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবীতেই যদি আল্লাহকে দেখা সম্ভব হত তাহলে এই জীবনের পরীক্ষা অর্থহীন হয়ে যেত। আল্লাহ্র মানবদৃষ্টির অন্ত রালে থেকে কেবল তার বিশ্বাসের মাঝেই অবস্থান করে তার পরীক্ষা নিতে চান। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিরাজের রজনীতেও স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখতে সক্ষম হননি।

১০ম ও ১১শ' অধ্যায়ে ওলী-আওলিয়া, পীরবাদ ও কবরপূজা সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি প্রসঙ্গে সূক্ষ্ম, যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যবহুল আলোচনার মধ্য দিয়ে পাঠককে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য করেছেন যে, এগুলো এমন সব শিরকী মতবাদ ও ধর্মাচার, যা গ্রীক ও পৌরাণিক মরমী সাধকদের দ্বারা তৈরী হয়ে সূফীবাদী গোষ্ঠীর মাধ্যমে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। ইসলামে এসব দর্শন চরমভাবে অগ্রহণযোগ্য ও ভিত্তিহীন। গাউছ, কুতুব, আবদাল প্রভৃতি পরিভাষা খৃষ্ট ধর্মের পৌরাণিক কাহিনী থেকে গৃহীত হয়েছে। তাসবীহ জপ করা খৃষ্টীয় জপমালা থেকে এবং মীলাদুন্নবী খৃষ্টানদের সবচেয়ে বড় উৎসব 'ক্রিসমাস' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের 'নির্বাণ' থেকে ফানা ফিল্লাহ দর্শনের উৎপত্তি। খৃষ্টসমাজের নিওপ্লাটনিক দর্শন থেকে সংসারবিরাগী পীরবাদের উৎপত্তি। সূফীদের খানকাগুলোর সাদৃশ্য পাওয়া যায় খৃষ্টান সাধুদের আশ্রম থেকে। পীর, সাধু, গুরু ও তাদের অলৌকিক ক্ষমতা– এ সবই একই দর্শনের অনুসারী বৈরাগী মানুষের মুসলিম, খৃষ্টান ও হিন্দু নাম। মাযার, তীর্থস্থান ও সেখানে প্রার্থনা করার পদ্ধতি সবকিছুতেই রয়েছে অভিন্ন মিল। যদিও ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন। এভাবেই শিরকে একাকার হয়ে গেছে অন্যান্য ধর্মের লোকদের সাথে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বড় একটা অংশও। যারা নামে মুসলিম হলেও পরিস্কাররূপে মুশরিক।

উপসংহারে তিনি মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য যে আল্লাহ্র ইবাদত তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা- সে সম্পর্কে আলোকপাত করে তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এজন্য আমাদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা, পরিবার ও সমাজের সাথে আবেগপূর্ণ বন্ধনকে একপাশে রেখে নির্ভেজাল তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন করতে হবে আর মৌলিক দু'টি শর্ত পূরণ করতে হবে–(১) একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই সকল কাজ করা ও (২) রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত মোতাবেক তা পালন করা। আম্বিয়ায়ে কেরাম যে ইসলাম প্রচার করেছিলেন তা কোন আবেগতাড়িত তত্ত্ব ছিল না; বরং তা ছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কাছে নিরংকুশ আত্মসমর্পণের এক নিরবচ্ছিন্ন পরিকল্পনা। নিছক আবেগীয় নিষ্ক্রমণ আর আপেক্ষিক কিছু উপমায় নির্ভর করে কোন প্রকৃত মুমিন এই পরিকল্পনার বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। যদি কেউ নেয় তবে সে যত বড় ঈমানের ঘোষণাদাতা হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে তার এবং একজন মূর্তিপূজকের মাঝে মৌলিক কোন ফারাক নেই।

তাওহীদ ও শিরকের খুঁটিনাটি দিকগুলো ভিন্ন আঙ্গিকে জানার জন্য বইটি পাঠকের জন্য খুব উপযোগী হতে পারে। বিশেষত লেখক জনাব বিলাল ফিলিপ্স নিজে অমুসলিম পরিমণ্ডল থেকে আসায় এবং নানা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হওয়ায় বইটিতে তাঁর বিশ্লেষণ অনেক ধারালো হয়েছে। ফলে আধুনিক প্রেক্ষাপটে শিরকের কারণ ও উপলক্ষগুলো চিহ্নিত করা পাঠকের জন্য অনেকটা সহজ হবে। সাথে সাথে তাওহীদের মূল দিকটি স্বচ্ছ-সরলভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। ড. মানে আল-জুহানী বইটি সম্পর্কে বলেন, 'আল্লাহ্র একত্ববাদ সম্পর্কে এ বইটি একটি বিশেষ গবেষণামূলক উপস্থাপনা এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদানও বটে। ফলত, মানব জীবনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে আমি প্রতিটি মুসলিমের জন্য এ বইটি অবশ্য পাঠ্য বলে মনে করি। উপরন্তু, যে সব অমুসলিম পাঠক ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্র একত্ববাদকে জানতে আগ্রহী তাদেরও প্রয়োজন পূরণ করবে বলে আশা রাখি'। সর্বোপরি অনুবাদক আবু হেনা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন লেখকের উপস্থাপনা ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখতে।

একজন আউরা ফারাহ ও তার ইসলাম গ্রহণ

মেহেদী আরীফ

[স্পিনোজা রোমো নামের সদ্য কৈশরোত্তীর্ণ এই কলম্বিয়ান স্কুলছাত্রী ইসলাম গ্রহণ করেছেন গত ২৭ই জুন ২০০১। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাকে বাড়ি-ঘর ছাড়া হতে হয়। কিছুদিন চাচার বাড়িতে অবস্থানের পর এ বছর জানুয়ারী মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার পরিবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। নিম্নে তার লিখিত ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সংক্ষেপায়িতভাবে অনূদিত হল]

১. কলম্বিয়ার কালি শহরের এক ক্যাথলিক খৃষ্টান পরিবারে আমার জন্ম। ধার্মিক পরিবেশে বেড়ে উঠা সত্ত্বেও ক্যাথলিকদের পৌত্তলিক ধাঁচের পূজা-অর্চনা আমাকে সবসময়ই অপ্রতিভ করে রাখত। সবসময় আমার ভাবনায় এটা ছিল যে, উপাসনার এ পদ্ধতিতে কোথাও ভুল রয়েছে। অতঃপর একদিন আমি প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টানদের এক গীর্জায় গেলাম। সেখানে আমি বেশ স্বস্তি বোধ করলাম। কেননা তারা ছবির পূজা করে না। ছবির ব্যাপারে পূর্ব থেকেই আমার এ সংশয় অক্ষুণ্ন ছিল যে, 'এরা তো কিছুই শোনে না বোঝে না'। যা হোক আমি প্রটেস্ট্যান্ট উপাসনারীতিতে সন্তুষ্ট হলাম। যদিও আমি তাদের হাতে ব্যাপটাইজড্ হইনি। আমি তাদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখতাম। সেজন্য আমার প্রটেস্ট্যান্ট বন্ধুরা আমার বাড়িতে আসত এবং অনুযোগ করত যে, আমি যিশুর চার্চ থেকে দূরে থাকি কেন? আমি তাদের সাথে না যাওয়ার জন্য বিভিন্ন ওজর-আপত্তি দেখাতাম। কেননা আমি তাদের বিশ্বাসের যথার্থতা নিয়ে সন্দিগ্ধ ছিলাম। কেননা তারা বারবার 'হলি স্পিরিট' (পবিত্র আত্মা)-এর নাম করত যা নাকি খৃষ্টবিশ্বাসী আত্মায় মিশে থাকে। এ বিশ্বাসটি আমার কাছে অলৌকিক মনে হল। তাই তাদের কাছ থেকে দূরে থাকাটাই ভাল মনে করলাম। অন্যদিকে আমার প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় রীতির অনুসারী হওয়াকে আমার পরিবার মোটেও গ্রহণ করেনি। তাই আমি যখন তাদেরকে পরিত্যাগ করলাম তখন আমার পরিবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

২. অতঃপর আমি আবার গভীরভাবে ভাবা শুরু করলাম ঐ বিষয়ে যা আমি ইতিপূর্বে খুঁজে ফিরছিলাম। কেননা আমি সারাজীবনই ক্যাথলিক গীর্জার কর্মকাণ্ডে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি, তারপর একটি বছর প্রটেস্ট্যান্ট রীতিতে এসে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেলাম; কিন্তু অচিরেই আবার অপূর্ণতার মুখোমুখি দাঁড়ালাম। আমি বুঝতে পারি না কেন যেই মাত্র আমি আমার প্রটেস্ট্যান্ট বন্ধুদের সাথে খুব সুখী বোধ করছিলাম, তখনই হঠাৎ একই অনুভূতি হাজির হল যা আমার ক্যাথলিক পরিবেশে থাকা অবস্থায় বর্তমান ছিল। কেন এরূপ হচ্ছে যদি সবই ঠিক থাকে? আমি যেন নিঃশেষিত হয়ে গেলাম। তারপরও ঈশ্বরের আরাধনা ও বিশ্বাসের মৌলিক বিষয় জানা ব্যতিরিকেই আমি নিজের ভিতরে তাঁকে বিশ্বাসের বাধ্যবাধকতা অনুভব করলাম।

৩. আমি একদিন ইন্টারনেটের এক সামাজিক সাইটে একটি এ্যাকাউন্ট খুললাম। সেখানে আমার অবস্থান লিখলাম 'চীন'। ফলে শীঘ্রই চীনারা আমাকে এ্যাড করা শুরু করল। তারা ছিল সুন্দর মনের মানুষ। কিন্তু তারা অধিকাংশই ছিল বৌদ্ধ। পূর্বেই আমার জানা ছিল যে তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, কাজেই তারা সবকিছু আরও দুর্বোধ্য করে তুলল। হা-হা-হা...। বিরক্ত হয়ে আমি এ্যাকাউন্ট চেক করা বন্ধ করে দিলাম। একদিন কি মনে করে এ্যাকাউন্ট চেক করতে যেয়ে এক মেয়ের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দেখলাম। যার নাম ছিল 'হালা' যা কাকতালীয়ভাবে আমার নামের (আউরা) আরবী অনুবাদ। সে ছিল ১৪ বছরের এক মুসলিম বালিকা। আমি ততদিন ১৫ পার করেছি। আমি ভাবলাম, হোক না সে মুসলিম, সে তো কমপক্ষে একজন মানুষ (যেহেতু মিডিয়ায় আমি ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে সবসময়ই খারাপ সংবাদ পেতাম। তাতে ইসলামের সঠিক তথ্যও প্রকাশিত হত না। তাই মুসলমানদের সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখতাম না)। যা হোক তার রিকুয়েস্ট কনফার্ম করলাম। অতঃপর সে আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দিল। কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। পরে তার বোন সারাও আমাকে এ্যাড করে নিল এবং আরো ভালভাবে ইসলাম সম্পর্কে বুঝাল। কিন্তু তাতেও আমার ভিতর থেকে সন্দেহ দূর হল না। আমার মনে হল এটা খৃষ্টান ধর্ম থেকে পৃথক তেমন কিছু নয়। কেননা খৃষ্টানরাও বিশ্বাস করে যীশুখৃষ্টই পরকালীন মুক্তি লাভের একমাত্র পথ।

৪. আমি মুসলিমদের সাথে আরও কথা বলতে চাইলাম। যাতে জ্ঞানের উৎসসমূহের কাছাকাছি হতে পারি। তিউনিসিয়ার ফাতিমা নাম্নী এক মেয়ে আমাকে এ্যাড করেছিল। সে ছিল ফেসবুকে ইসলাম বিষয়ক একটি ফ্যান পেজের এডমিন। তার সাথে পরিচয় ইসলাম সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে আমার জন্য খুব সহায়ক হয়েছিল। আমার একবছর লেগেছিল পূর্ণভাবে জানতে যে, যীশুখৃষ্ট ক্রসবিদ্ধ হয়ে মারা যাননি। এটা নিশ্চিত হওয়ার পর আমি বিষয়টি আরো যুক্তি দিয়ে ভাবার চেষ্টা করলাম। যেমন-

- কুরআন আমাদেরকে বলে, 'কেউ কারো পাপের জন্য দায়ী নয়'। এটা খুবই সুস্পষ্ট বক্তব্য।

- কুরআনও বলছে যে, যীশু হলেন কুমারী মেরী (মরিয়ম)-এর বৈধ গর্ভজাত সন্তান ও ঈশ্বরের প্রেরিত নবী। সুতরাং খৃষ্টানদের আপত্তি করার সুযোগ নেই যে, মুসলমানরা যীশুকে অস্বীকার করে। বরং মুসলমানরা আরো ঊর্ধ্বে মনে করে যে যীশু দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসবেন।

- যদি ঈশ্বর প্রথম মানুষ আদম (আঃ)-কে পিতামাতা ছাড়াই জন্ম দিতে পারেন তবে স্বভাবতই মেরীর গর্ভে যীশুর জন্মদান কি আরো সহজ নয়, যেন যীশু স্বাভাবিকভাবে সৌহার্দ্যের পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারেন? ঈশ্বরের তো কেবল এতটুকু বলার অবসর যে, 'হও'। তখনই সবকিছু হয়ে যায়।

- খৃষ্টানরা শতভাগ অস্বীকার করে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) হলেন আল্লাহ্‌র নবী। যদিও তারা জানে যে, মুহাম্মাদ ইসমাঈলের বংশধর (ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তান)। অপরপক্ষে আমরা মুসলমানরা যীশুকে ঠিক সেভাবেই গ্রহণ করি যেভাবে মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে গ্রহণ করি। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই সর্বশেষ নবী। তার পরে আর কেউ যদি নবুয়ত দাবী করে তবে সে একজন ডাহা মিথ্যুক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি পরিস্কার করে দিয়েছেন গসপেলের দুরবস্থা। পুরো বাইবেলই পরস্পরবিরোধী কথাবার্তায় ভর্তি। কোন ঐশ্বরিক বার্তা এমন ভুলে পূর্ণ হতে পারে না। আমি নিশ্চিত যে, বাইবেল মানুষেরই রচিত কিছু জ্ঞানী মানুষের কাহিনী সম্বলিত গ্রন্থ। তাই বাইবেল কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ নয়।

মোটা দাগে আমি বলতে চাই, আমরা এ্যান্টি ক্রাইস্ট বা যীশুবিরোধী নই বরং আমরা তারাই যারা যীশুর প্রকৃত পরিচয় জানে।

অবশেষে মুসলিম বন্ধুদের সাথে কথা বলে আমি লক্ষ্য করেছিলাম, একজন নারী ইসলামে কত গুরুত্বপূর্ণ। আমি এ ব্যাপারে আগে যা শুনেছিলাম সবই মিথ্যা গাল-গল্প। যেমন- মুসলিম নারীদের কোন অধিকার নেই, মুসলিম পুরুষরা বহু স্ত্রী রাখে, তারা স্ত্রীকে মারধর করার অধিকার রাখে, মুসলিম নারী কথা বলতে পারে না, স্বামীর

Contents

কাছে ডিভোর্স চাইতে পারে না...ইত্যাদি। যে সব লোক এসব প্রচার করে তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সুন্নাতের ব্যাপারে ১% ধারণাও রাখে না। অতঃপর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম সচেতনভাবেই, প্রায় দুই বছর যাবৎ এ সুন্দর ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়নের পর।

৫. ইতিপূর্বে আমার পরিবার আমার উপর বিরক্ত ছিল প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় রীতি গ্রহণ করার কারণে। আর এখন তারা ক্রোধের সমুদ্রে ভাসছে আমি ইসলাম গ্রহণ করায়...হাহা। এর কারণ হল ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা। আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই যে, তিনি আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন এবং তাকে আরাধনার সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তিনি জন্মিত নন বা কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং সর্বজ্ঞ। তার কোন ত্রয়ীর প্রয়োজন নেই। কেননা তিনি তার আপন অস্তিত্বে অদ্বিতীয়। আমাদের প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ সকল কিছুকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন। আমি দুই বছর আগে যখন ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা শুরু করি, তখন আমার পরিবার ও আমার বন্ধুরা এটাকে নিতান্তই ছেলেমানুষী কৌতুহল বলে মনে করত। তারা কৌতুক করে আমাকে জিজ্ঞাসা করত– বলত কিভাবে বোমা তৈরী করতে হয়? ইত্যাদি নানা বাজে মন্তব্য। অতঃপর যখন আমি সত্যিই ইসলাম গ্রহণ করলাম তখন তারা আমার উপর চরমভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা বুঝতেই চাইল না আমার এ কাজ মোটেও কৌতুক নয় এটা বাস্তব। অতঃপর আমি সবচেয়ে কষ্ট পেয়েছিলাম যখন ডিসেম্বর মাসে আমার পিতা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন এবং আমাকে চাচার বাড়িতে যেয়ে আশ্রয় নিতে হল। এ বছর ৩১ জানুয়ারী আমি আবার বাড়ি ফিরতে পেরেছি আমার অসুস্থতার কারণে। *আলহামদুলিল্লাহ*।

এবার **খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য** : খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে যে, প্রাণীরা সবসময় একইরূপ ছিল। এ সকল প্রাণী ছাড়া আর কোন প্রাণের অস্তিত্ব কোথাও নেই। এখন ডাইনোসর, এলিয়েনদের ব্যাখ্যা তারা কি দেবে? অপরদিকে এ ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য যে, আল্লাহ্‌র এমনও জিনিস সৃষ্টি করেছেন যেসব সম্পর্কে আমাদের সামান্যতম জ্ঞানও নেই। আর তিনি দৃশ্যমান, অদৃশ্য সকল কিছুরই স্রষ্টা। সুতরাং খৃষ্টানদের মৌলিক বিষয়ের দিকে নজর দিয়ে অযথা ধারণা করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। আর সত্যের মোকাবিলা করা উচিৎ যেভাবে আমি করেছি। এটা আক্রমণ নয়। হ্যা মানুষ হিসাবে আমরা ত্রুটিহীন নই। কিন্তু আমরা অনেক উঁচুতে উত্তীর্ণ হই যখন আমরা সত্যের মোকাবিলা করি।

খৃষ্টান অর্থ যীশুখৃষ্টের অনুসারী। এটা একটা মতবাদ যা মানুষের নিজেদের সুবিধা মত তৈরী করে নেয়া। কিন্তু মুসলিম অর্থ ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণকারী এবং ইসলাম অর্থ ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ। আমরা সঠিক পথেই ঈশ্বরের উপাসনা করি। ঈসা (আঃ) যেমন এসেছিলেন তাওরাতের ব্যাখ্যা করার জন্য, মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও ঠিক তেমনি এসেছিলেন গসপেলসহ সমগ্র বাইবেলের ব্যাখ্যা করার জন্য। এর মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। ইসলামে আমরা নির্দেশিত হয়েছি সকল নবীদেরকে সমানভাবে বিশ্বাস করতে। যদি তা না করি তাহলে আমাদের বিশ্বাস থাকবে অপূর্ণ; বরং তা হবে পূর্ণাঙ্গ অবিশ্বাসীর পরিচায়ক।

নিম্নে বাইবেলের কিছু বৈপরিত্য উল্লেখ করে আমার কথা শেষ করব।

১. ঈশ্বর আলোর মাঝে বাস করেন (টিম ৬:১৬)। ঈশ্বর অন্ধকারে বাস করেন (কিংস ৮:১২/পিএস, ১৮:১১/পিএস, ৯৭:২)।

২. ঈশ্বরকে দেখা যায় ও শোনা যায় (এক্সোডাস ৩৩:২৩ ও ৩৩:১১, জেনেসিস ৩২:৩০)। ঈশ্বর হলেন অদৃশ্য এবং তাঁকে শোনা যায় না (জন ১:১৮ ও ৫:৩৭, এক্সোডাস ৩০:২০/১)।

৩. ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, সবকিছু দেখেন, জানেন (প্রোভ ১৫:৩, জব ৩৪:২২,২১)। ইশ্বর সর্বত্র বিরাজমান নন, তিনি সবকিছু দেখেন না, সবকিছু জানেন না (জেনেসিস ১১:৫, ১৮:২০,২১ ও ৩:৮)।

৪. ঈশ্বর হলেন ন্যায়বিচারক, নিরপেক্ষ (জেনেসিস ১৮:২৫, ইজেয়ি ১৮:২৫)। ঈশ্বর হলেন অবিচারক ও একদেশদর্শী (জেনেসিস ৯:২৫, ম্যাথ্যু ১৩:১২)।

৫. ঈশ্বর হলেন পাপের নিয়ন্ত্রক (ইজেকায়া ২০:২৫)। ঈশ্বর পাপের উপর কোন ভূমিকা রাখেন না (জেমস ১:১৩)।

৬. ঈশ্বর হলেন যুদ্ধন্মত্ত (এক্সোডাস ১৫:৩)। ঈশ্বর হলেন শান্তিকামী (রোম:১৫:৩৩/১)।

৭. ঈশ্বর একক (ডেউট ৬:৪)। ঈশ্বর একক নন তার সত্তায় অংশীদারিত্ব রয়েছে (জেনেসিস ১:২৬,৩:২২,১৮:১-৩/১, জন ৫:৭)।

৮. ছবি বা প্রতিকৃতি নির্মাণ নিষিদ্ধ (এক্সোডাস ২০:৪)। ছবি বা প্রতিকৃতি নির্মাণ বৈধ ও নির্দেশিত (এক্সোডাস ২৫:১৮,২০)।

৯. যীশু আক্রমণ প্রতিরোধ না করার শিক্ষা দিয়েছেন (ম্যাথু ৫/৩৯, ২৬:৫২)। যীশু শারিরীক আক্রমণ করার শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিজেও আক্রমণ করেছেন (লুক ২২:৩৬, জন ২:১৫)।

১০. ব্যভিচার নিষিদ্ধ (এক্সোডাস ২০:১৪, হেব ১৩:৪)। ব্যভিচার সিদ্ধ (নাম ৩১:১৮, হস ১:২,২:১-৩)।

১১. মহিলাদের কোন অধিকার নেই (জেনেসিস ৩:১৬/১, টিম ২:১২, রো ১৪:৩৪/১, পেট ৩:৬)। মহিলাদের অধিকার রয়েছে (জাজ ৪:৪,১৪,১৫ ও ৫:৭, এ্যাক্টস ২:১৮, ২১:৯)।

১২. মানুষ সকল প্রাণীর পরে সৃষ্টি হয়েছে (জেনেসিস ১:২৫,২৬,২৭)। মানুষ সকল প্রাণীর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে (জেনেসিস ২:১৮,১৯)।

১৩. আব্রাহাম থেকে ডেভিডের ব্যবধান ছিল ১৪ প্রজন্ম (ম্যাথ্যু ১:১৭)। আব্রাহাম থেকে ডেভিডের ব্যাবধান ছিল ১৩ প্রজন্ম (ম্যাথ্যু ১:২-৬)।

১৪. শৈশবে যিশুকে মিসরে নিয়ে যাওয়া হয় (ম্যাথ্যু ২:১৪,১৫,১৯,২১,২৩)। শৈশবে যিশুকে মিসরে নিয়ে যাওয়া হয় নি (লুক ২:২২,৩৯)।

১৫. যীশুকে ক্রুসবিদ্ধ করা হয় ৩য় ঘণ্টায় (মার্ক ১৫:২৫)। যীশুকে ৬ষ্ঠ ঘণ্টার পূর্বে ক্রুসবিদ্ধ করা হয়নি (জন ১৯:১৪-১৫)।

১৬. জুডাস ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেন (ম্যাথ্যু ২৭:৫)। জুডাস ফাঁসিতে ঝুলেননি বরং অন্য কোনভাবে মারা যান (এ্যক্টস ১:১৮)।

১৭. যীশু ঈশ্বরের সমতুল্য (জন ১০:৩০, ফিল ২:৫)। যীশু ঈশ্বরের সমতুল্য নন (জন ১৪:২৮, ম্যাথ্যু ২৪:৩৬)।

১৮. কোন মানুষই পাপমুক্ত নয় (কিংস ৮:৪৬, রোম ৩:১০), খৃষ্টানরা পাপমুক্ত (জন ৩:৯,৬,৮)।

১৯. এই পৃথিবী ধ্বংস হবে (পেট ৩:১০, হেব ১:১১, রেভ ২০:১১)। এই পৃথিবী কখনই ধ্বংস হবে না (পিএস ১০৪:৫, ইসিসিএল ১:৪)।

২০. দীর্ঘজীবন লাভ করে খারাপ লোকেরা (জব ২১:৭,৮)। দীর্ঘজীবন থেকে বঞ্চিত হয় খারাপ লোকেরা (পিএস ৫৫:২৩, ইসিসিএল ৮:১২)।

এভাবেই বাইবেল শত-সহস্র বিচ্যুতি, বৈপরিত্যে ভরপুর যা কখনো ত্রুটিমুক্ত হিসাবে আখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। তাই এটা সুনিশ্চিত যে, বাইবেল একটি বিকৃত গ্রন্থ। এর অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা আর নেই। ইসলামের আগমনের পর আর কোন ধর্ম ঈশ্বরের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) তার নবী ও রাসূল।

মুসলিম যুবকদের প্রতি আহ্বান

মূল: আতেফ আব্দুল মুঈয আল-ফাইয়ূমী
অনুবাদ : আসিফ রেযা ও ওবায়দুল্লাহ

হে মুসলিম যুবক, জাতির স্তম্ভ, শ্রেষ্ঠ দানবীর, জাতি বিনির্মাণের সূতিকাগার এবং বিজয় ও সম্ভাবনাময় প্রজন্ম! তোমাদের জন্যই এই সকল বাণী-উপদেশ-নির্দেশনা; তোমাদের তরে তা উপস্থাপন করছি যেন আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা সকলকে উপকৃত করেন, প্রত্যেককে সঠিক পথের দিশা দেন এবং হিম্মত আরো বাড়িয়ে দেন। সুতরাং হে তরুণেরা! ভাল কথা মান্য করো এবং ছহীহ হাদীছ গ্রহণ কর।

যৌবন অপরিমেয় অনুগ্রহ এবং মহাপরীক্ষা :

হে মুসলিম যুব সম্প্রদায়! প্রথমেই তোমাদের জানা আবশ্যক যে, পার্থিব জীবনে তোমাদের বেঁচে থাকা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বড় অনুগ্রহ, যার জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক। এমর্মে আল্লাহ বলেন, 'কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা নির্জ্জীব ছিলে, পরে তিনি তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করলেন; পুনরায় তিনি তোমাদেরকে নির্জ্জীব করবেন, তৎপরে তোমাদেরকে জীবিত করবেন, অবশেষে তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে' *(বাক্বারাহ ২৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উপজীবিকা প্রদান করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন। তৎপর তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন। ফলত তোমাদের অংশী-উপাস্যগণের মধ্যে এমন কি কেউ আছে যে, এগুলো কোন কিছু করতে পারে? বস্তুতপক্ষে তিনি পবিত্রতম এবং তোমারা যে অংশী স্থির কর, তিনি সেগুলো হতে সমুন্নত' *(রূম ৫৪)*।

দুনিয়ার এই অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী অস্তিত্ব নয়; বরং তা অত্যন্ত স্তু ও সাময়িক। বস্তুত চিরন্তন নিয়ামত ও চিরস্থায়িত্ব হচ্ছে পরলোকে মহান আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ লাভ। সেখানে মানুষ ও জিন জাতিকে স্ব স্ব কর্মানুপাতে আল্লাহ্‌র রহমতে প্রতিদান দেয়া হবে। এ বিষয়ে তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'তবে যে বিশ্বাস স্থাপনকারী, সে কি দুষ্কর্মকারীর অনুরূপ? অবশ্যই তারা সমান নয়। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকার্য সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য স্বর্গোদ্যানের নিকেতন। তারা যা করেছিল, এটা (এই নিকেতন) তা-রই আতিথ্য-স্বরূপ। অপরপক্ষে যারা দুষ্কার্য সম্পাদন করে, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। যখনই তারা সেখানে থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে সেখানে পুণঃনিক্ষিপ্ত করা হবে এবং বলা হবে 'তোমরা জাহান্নামের শাস্তি আস্বাদন কর যে বিষয়ে তোমরা অসত্যারোপ করেছিলে। আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে বৃহত্তর শাস্তির পূর্বে লঘুতর শাস্তি আস্বাদন করাব যাতে তারা ফিরে আসে। আর কে সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর অত্যাচারী, যাকে স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও মুখ ফিরিয়ে নেয়; নিশ্চয় আমি অপরাধীদের প্রতিশোধ গ্রহণ করব' *(সাজদাহ ১৮-২২)*।

এমনি করে তোমাদের আরো জানা উচিত যে, যৌবনকাল আল্লাহ প্রদত্ত আয়ুষ্কালের সংক্ষিপ্ত এক অংশ এবং অবশ্যই তোমাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হতে হবে ও হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর তোমরা প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের এই মূল্যবান মুক্তাকে কাজে লাগানো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করা। হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে বললেন, পাঁচটি বস্তুর পূর্বে পাঁচটি বস্তুকে গণীমত মনে করবে। (১) বার্ধক্যের পূর্বে তারুণ্যকে, (২) অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে (৩) দারিদ্র্যের পূর্বে স্বচ্ছলতাকে (৪) ব্যস্ত তার পূর্বে অবসরকে এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে *(আলবানী, ছহীহুল জামে' হা/১০৭৭)*।

আবূ বারযাহ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বিচার দিবসে চুল পরিমাণ নড়তে পারবে না। (১) তার সময় সম্পর্কে, কোন কাজে তা ব্যয় করেছে (২) তার জ্ঞান সম্পর্কে, কতটুকু আমল করেছে (৩) তার সম্পদ সম্পর্কে, কিভাবে তা উপার্জন করেছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে এবং (৪) তার শরীর সম্পর্কে, কোন কাজে সে তা ব্যবহার করেছে *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ)*।

এমনকি হাদীছে এসেছে যে, জান্নাতের সকল অধিবাসী হবে যুবক এবং হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) হবেন সকল যুবকের নেতা। *(হাকেম, তিরমিযী, সিলসিলা ছহীহা হা/৪৩৮২)*।

এভাবে রাসূল (ছাঃ) যুবকদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন এবং পরিপূর্ণ প্রতিদান জান্নাতুন নাঈম-এর অঙ্গীকার করতেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, হে কুরাইশ যুবদল! নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত কর, ব্যভিচার করো না। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি স্বীয় লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত *(হাকেম ও বায়হাকী; আলবানী ছহীহ বলেছেন)*। হাসান সূত্রে বায়হাকীতে এসেছে, হে কুরাইশ যুবদল! ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না। নিশ্চয় যে ব্যক্তির যৌবন পাপ থেকে বেঁচে থেকেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সুতরাং তোমরা যৌবনের তারুণ্যকে সুউচ্চ মর্যাদা, কল্যাণ, সৎকর্ম, বিজয় ও অপার সম্ভাবনার পথ হিসাবে বেছে নাও।

বয়স ও সময় অপচয় থেকে সতর্ক হওয়া :

হে যুবসমাজ! আনুগত্যহীনতা ও অলসতায় যৌবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়কে অপচয় করা হতে সাবধান থেকো। আরো সাবধান থেকো পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে তা ধ্বংস করা হতে। কেননা বিচার দিবসে যার পুণ্যের পাল্লা হালকা হবে, সে ব্যক্তিই সেদিন সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সে দিনের সে কঠিন মুহূর্তে সে পার্থিব জীবনে ফিরে আসতে চাইবে, কিন্তু তা আর সম্ভব হবে না। এ মর্মে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, 'এমনকি যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করুন যেন আমি সেখানে সৎকার্য করতে পারি যে কার্যগুলো আমি পরিত্যাগ করেছিলাম। কখনোই নয়, সে যা বলছে তা কথার কথা মাত্র। বস্তুত তাদের সম্মুখে উত্থান দিবস পর্যন্ত আবরণী থাকবে। অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন তাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার বন্ধন

থাকবে না এবং তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাও করবে না। সুতরাং যাদের (পুণ্যের) পাল্লা ভারী হবে, তারা হবে সফলকাম। আর যাদের পুণ্যের পাল্লা হালকা হবে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হবে। অনল তাদের মুখমণ্ডল ঝলসিয়ে দিবে এবং সেখানে তারা বিবর্ণ হয়ে যাবে' *(মুমিনূন ৯৯-১০৪)*।

এমনিভাবে তোমাদের এটাও জেনে রাখা উচিত যে, সময়-ই তোমাদের মূল সম্পদ। যদি সময় বাজে কাজে ও ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে অপচয় হয়, তাহলে মানুষ তার বয়স ও তারুণ্যের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলবে। কেননা আল্লাহ্র আনুগত্য, তাঁর সন্তুষ্টি ও ইবাদতেই নিহিত রয়েছে সময় ব্যয়ের সার্থকতা। সময়ের সদ্ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে প্রত্যেকের জন্য কল্যাণ ও সমৃদ্ধি। অপরপক্ষে সময় অপচয়ে রয়েছে আত্মপ্রতারণা। ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দু'টি নে'মতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই ধোঁকায় পড়ে রয়েছে। (১) সুস্থতা এবং (২) অবসর *(বুখারী)*।

পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাব, মহান আল্লাহ দিবা-নিশি, প্রাতঃকাল, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন ইত্যাদির শপথ করেছেন। বস্তুত সৃষ্টিতে স্বীয় ক্ষমতার নিদর্শন স্বরূপ এবং শরী'আত নির্দেশিত পথে সময়ের সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্যই আল্লাহ এমনটি করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনে এবং দিবস ও রজনীর পরিবর্তনে জ্ঞানবানের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। (জ্ঞানবান তারা) যারা দণ্ডায়মান, উপবেশন ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে (বলে), 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এগুলো বৃথা সৃষ্টি করেননি। আপনি পবিত্রতম। অতএব আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন' *(আলে ইমরান ১৯০-১৯১)*।

অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হল, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান হেলায়-ফেলায় সময় নষ্ট করে চলেছে, কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনে প্রচেষ্টাহীনভাবে সময় কাটাচ্ছে। কখনো কখনো পাপকর্মে নিমজ্জিত হয়ে, অনর্থক স্থানে বা চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে, অসৎ সঙ্গীর সাথে এবং পরশ্রীকাতরতা ও কুৎসা রটনার মত গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে মূল্যবান সময়কে নির্বিকার নষ্ট করছে। এমনকি তারা বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও অশ্লীল সাইটে দিবা-রাত্রি অতিবাহিত করছে। যেখানে যেনা-ব্যভিচার, অশ্লীলতা-বেলেল্লাপনার দৃশ্য। এতে ব্যক্তিত্ব-পৌরুষত্ব-লজ্জা বলতে কিছুই থাকে না। বরং মুসলমানদের মাঝে গর্হিত কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুতপক্ষে একজন প্রকৃত ও জ্ঞানবান মুসলিমের নিকট এগুলো অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

আলী (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদের জন্য দুইটি বিষয়ে শঙ্কিত। (১) উচ্চাকাঙ্খা এবং (২) প্রবৃত্তির অনুসরণ। কেননা উচ্চাকাঙ্খা মানুষকে পরকাল বিমুখ করে দেয় এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ সত্য থেকে বিচ্যুৎ করে।

আওন বলেন, আজকের দিনে পদার্পণকারী কত ব্যক্তি সে দিনকে পরিপূর্ণ করতে পারছে না এবং আগামীকালের অপেক্ষাকারী সেদিনে পৌঁছাতে পারছে না। যদি তোমরা সময় ও তার প্রবাহের প্রতি লক্ষ্য কর তাহলে অবশ্যই আকাঙ্খা ও তার প্রতারণা তোমাদেরকে ক্রদ্ধ করবে। কবি বলেন,

دقات قلب المرأ قائلة له * إن الحياة دقائق وثوانى

'ব্যক্তির হৃদয়স্পন্দন তাকে বলে, জীবন হচ্ছে কয়েক সেকেণ্ড ও মিনিটের সমাহার'।

সময় সম্পর্কে ঔদাসীন্য বড়ই বিপজ্জনক ব্যাপার। কেননা উদাসীনতা হচ্ছে ঘাতক সদৃশ ক্ষতিকর; দুরারোগ্য ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধি। আর এই আলস্য তথা উদাসীনতা এমন পন্থা যাতে গুটিকয়েক রহমতপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই নিপতিত। এই ব্যাধি কয়েক শতাব্দী থেকে মুসলিম সমাজে অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করে স্বীয় লক্ষ্য অর্জনে বাঁধ সেধেছে, তার শক্তি দুর্বল করে ফেলেছে, এমনকি পার্থিব জীবনে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনেও তাকে নির্লিপ্ত করেছে। চিন্তাশীল ও ভাবুক ব্যক্তিমাত্রই কুরআনের আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে সেখানে আল্লাহ তা'আলা অলসতা নামক ধ্বংসাত্মক ব্যাধির ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন, এই ব্যাধি দেখতে পাবে যে তা জাতির ওপর চেপে বসেছে, জাতিকে লক্ষ্যচ্যুত করেছে এবং আল্লাহ্র শাস্তিকে ত্বরান্বিত করেছে। এমর্মে আল্লাহ বলেন, 'যেন আপনি সে সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করেন যাদের পিতৃপুরুষগণ ভীতি প্রদর্শিত হয়নি। ফলে তারা অমনোযোগীই থেকে গিয়েছে। নিশ্চয় তাদের অধিকাংশের ওপর সেই বাক্য সত্যে পরিণত হয়েছে, ফলে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না *(ইয়াসীন ৬-৭)*।

সালাফে ছালেহীনের সময়নিষ্ঠা :

আমাদের পূর্বপুরুষগণ সময়ের যথাযথ ব্যবহারে ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। ফলে উভয় জগতের সাফল্য তাদের করতলে আসতে বাধ্য হয়। আবুল ওয়াফা বিন আকীল বলেন, জীবনের এক মূহূর্ত সময় নষ্ট করাও আমার জন্য সমীচীন নয়। এমনকি আমার জিহ্বা ও চক্ষু অধ্যয়ন করতে অপরাগ হয়ে গেলে আমি একটু বিশ্রাম নিব মনে করি। এতদত্ত্বেও মনের গহীনে উদিত কথা না লেখা পর্যন্ত আমি উঠতে পারিনা। ইবনুল জাওযীর কাছে যখন এমন ব্যক্তি আসত যার সম্পর্কে তার ধারণা হত যে, সে তার সময় নষ্ট করবে। তখন তিনি সময় নষ্ট না করার জন্য কলম প্রস্তুতকরণ ও খাতার পাতা ঠিক করতে ব্যস্ত থাকতেন।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি ঐদিনের মতো কোন দিনের জন্য আফসোস করি না যে দিনের সূর্য অস্তমিত হয়ে যাচ্ছে এবং আমার বয়স কমে যাচ্ছে, কিন্তু আমার আমল বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, সময়ের অপচয় মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। কেননা সময়ের অপচয় ব্যক্তিকে আল্লাহবিমুখ ও আখেরাতবিমুখ করে দেয়। পক্ষান্তরে মৃত্যু মানুষকে পার্থিব জগতের ভোগ-বিলাস থেকে বিমুখ করে। হাসান বাছরী বলেন, আমি অনেক লোককে দেখেছি যারা নিজেদের সময় সম্পর্কে তোমাদের সম্পদ সচেতনতার চেয়েও অধিকতর সচেতন ছিলেন।

ছাহাবীদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুধাবন করা :

হে যুব সম্প্রদায়! তোমরা কখনো ভুলে যেওনা যে, যারা প্রথম দাওয়াতে রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যারা তাঁকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছিলেন, বিপদসঙ্কুল মুহূর্তে তাঁর সাথে হিজরত করেছিলেন, তারা অধিকাংশ-ই ছিলেন তেজোদীপ্ত যুবক। যেমন আবু বকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন। অনুরূপ মুছ'আব বিন উমায়ের, আলী বিন আবু তালেব, আরকাম বিন আবিল আরকামসহ আরো অনেকে। এরা মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে ঈমান এনেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্র একত্ববাদ ও দাসত্বের গুরুভার নিয়ে দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এক আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং অপরকে ইবাদতের প্রতি আহ্বান করাই ছিল

তাদের লক্ষ্য। ফলে ইসলাম ও ঈমানের শক্তিতে এক এক করে পৃথিবীর বহু দেশ তারা জয় করেছিলেন। যদ্দরুণ বাধাহীন গতিতে তারা রিসালাতের বাণী প্রচার করতে পেরেছিলেন। তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। কেননা তারা পার্থিব জীবনে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বেশ ভালভাবেই অবগত হয়েছিলেন। তারা এও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, কেন আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ পরকালে জান্নাতে তাদের জন্য কি প্রস্তুত করে রেখেছেন এ সম্পর্কেও তারা অবহিত ছিলেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'যখন বিশ্বাসীরা শত্রুদল সমূহকে প্রত্যক্ষ করল তখন বলতে লাগল, 'এটা তো তা-ই যে বিষয়ে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্য আরও বৃদ্ধি পেল। বিশ্বাসীগণের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছে যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করে, সুতরাং তাদের কেউ কেউ (শাহাদাতের) মানত পূর্ণ করেছে এবং কেউ কেউ অপেক্ষমান রয়েছে এবং (নিজেদের সংকল্পকে) বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করেনি। যেন আল্লাহ সত্যবাদীগণকে তাদের সত্যিকার প্রতিদান দেন এবং চাইলে কপট-বিশ্বাসীদের শাস্তি প্রদান করেন অথবা ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পরমদয়ালু অতিশয় ক্ষমাশীল' *(আহযাব ২২-২৩)*।

ইসলামের প্রাক্কালে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সাথীগণ স্বীয় নীতিতে অবিচল ছিলেন। সকল প্রকার ষড়যন্ত্র, প্রবঞ্চনা, বাধা-বিপত্তি, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, বয়কট এবং হাযারো উস্কানিতেও তারা ধৈর্য হারাননি। তারা নিজেদের সম্পদ এমনকি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজনকে একমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যেই বিসর্জন দিয়েছিলেন। সত্য ও নীতির ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে তারা ছিলেন একমাত্র আদর্শ। সময় ব্যয় ও সহযোগিতা করার ব্যাপারে তারা ছিলেন অনন্য।

প্রত্যেক ছাহাবী পৃথিবীতে স্বীয় অস্তিত্বের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে তাঁরা নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণে পূর্ণ সজাগ ছিলেন এবং আল্লাহ্র পথে উত্তম পদ্ধতিতে জিহাদ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁরা আমাদের জন্য আদর্শ। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর পরে তাদেরকে-ই অনুপম আদর্শরূপে আমাদের গ্রহণ করা উচিৎ। মোটকথা আমাদের কর্তব্য তাদের অনুকরণ-অনুসরণ করা।

আজকের যুবসমাজ ও পূর্ববর্তী মনীষীগণের মাঝে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। বর্তমান যুবকেরা জীবনের মৌলিক লক্ষ্য সম্পর্কে উদাসীন। তারা অবৈধ প্রণয়, গান-বাজনা, হাসি-তামাশা, উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ানো ও ঈমান-আখলাক ধ্বিংসী সাহিত্য অন্বেষণের মত গুরুত্বহীন নিকৃষ্ট কাজকে নিজেদের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে। সুতরাং স্বীয়কর্তব্য অবগত যুবক ও কর্তব্যজ্ঞানহীন যুবকদের মাঝে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন যুবকেরা দায়িত্ব পালনের তরে সার্বিক প্রচেষ্টা চালায় এবং তা বাস্তবায়নে কোনরূপ ত্রুটি করে না। নিঃসন্দেহে পরকালে এরাই সফলকাম।

সূরা আনকাবূতের ৬৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'যারা আমার তরে জীবন বিলিয়ে দিবে, আমি তাদেরকে অবশ্যই সুপথ প্রদর্শন করব, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন।

সুতরাং সময় দ্বারা উপকৃত হওয়ার একটি মাত্র পথ রয়েছে। তা হল প্রত্যেক মুসলমানকে নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তা বাস্তবায়নে কাজ করবে।

ইবাদতই আমাদের মহান দায়িত্ব ও পার্থিব জীবনে কর্তব্য। আর ইবাদতে যে ধরনেরই হোক না কেন, তাতে ব্যস্ততা রয়েছে।

মুসলিম যুবকদের উচিৎ এই গুরুত্বপূর্ণ ও মহান লক্ষ্যকে উপলব্ধি করা। পৃথিবীতে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা। তিনি আমাদেরকে মহৎ উদ্দেশ্যে স্বীয় প্রজ্ঞায় সৃষ্টি করেছেন। আর সে উদ্দেশ্য হচ্ছে কাউকে আল্লাহ্র সাথে শরীক না করে একমাত্র তাঁর ইবাদত করা।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে (শিরক প্রসঙ্গে) আগেই বলে দিয়েছেন যাতে কেউ বিচার দিবসে বিপত্তি করতে না পারে। যেমন তিনি বলেন, 'আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*। অত্র আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ আমাদেরকে অনর্থক খেল-তামাশা, প্রবৃত্তির পূজায় ব্যস্ত থাকা ও পার্থিব জগতের ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-উল্লাসে ডুবে থাকার জন্য সৃষ্টি করেননি। নিশ্চয় তিনি আমাদেরকে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ্র ইবাদত করা বলতে বুঝায় ব্যক্তির পুরো জীবনটা আল্লাহ্র আদেশ পালনে উৎসর্গ করা এবং তিনি যে সকল বিধান স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে প্রবর্তন করেছেন, তা পালন করা। এমর্মে তিনি বলেন, 'হে নবী আপনি বলে দিন, 'আমার ছালাত, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই বিশ্বচরাচরের অধিপতি আল্লাহ্র জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই আর এই দাওয়াতের ব্যাপারেই তো আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম মুসলিম' *(আন'আম ১৬২-৬৩)*। সুতরাং নযর-নেওয়াজ, কোরবানী, ইবাদত, কোনকিছুই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ পাওয়ার অধিকার রাখে না।

মহানবী (ছাঃ)-ই ইবাদতে অনুপম দৃষ্টান্ত :

হে তরুণসমাজ! যদি আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন-চরিতের প্রতি লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাব যে, রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের জন্য ইবাদত ও আল্লাহ্র হুকুম অনুসরণে মহৎ দৃষ্টান্ত পেশ করে গেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা খোদ রাসূলকে-ই মহৎ দৃষ্টান্ত ও উত্তম আদর্শ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই আদর্শকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মুসলিমের অনুকরণ-অনুসরণ করা উচিৎ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে এবং সে ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহকে ও পরকালকে প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ করে' *(আহযাব ২১)*।

রাসূলের ইবাদত-পদ্ধতি :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাক্কী জীবনে গভীর রাতে আরামের নিদ্রা পরিত্যাগ করে ছালাত আদায় করতেন, অর্থ বুঝে তারতীল সহকারে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, কুরআন থেকে পাথেয় ও ঈমান আহরণ করতেন। যাতে করে তিনি অধিক আল্লাহভীতি অর্জন করতে পারেন। রিসালাতের মহান দায়িত্ব নিয়ে বিশ্বব্যাপী আল্লাহ্র বাণী প্রচারে ব্রতী হন। তার মাক্কী জীবনের ইবাদত-সম্পর্কে সূরা মুযযাম্মিলের দিকে লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সেখানে আল্লাহ বলেন, 'হে চাদরাবৃত ব্যক্তি। রাত্রিকালে (ছালাতে) দণ্ডায়মান থাকুন কিয়দাংশ রাত্রি ব্যতীত। অর্থাৎ অর্ধেক রাত্রি অথবা অর্ধেক থেকেও কিছু কম করুন। অথবা অর্ধাংশ থেকে কিছু বৃদ্ধি করুন এবং (ছালাতে) খুব স্পষ্টভাবে কুরআন তেলাওয়াত করুন। আমি অচিরেই আপনার প্রতি এক গুরুভার বাণী প্রেরণ করব। নিশ্চয় রাত্রে গাত্রোত্থান করা কঠোর আত্মসংযম ও উচ্চারণে অনুকূলে। কেননা দিনে তো

আপনার নানাবিধ ব্যস্ততা থাকে। আর আপনি স্বীয় প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি মগ্ন হন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত কোন সত্য মাবূদ নেই, অতএব তাঁকে-ই কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করুন। তারা যা বলে তাতে ধৈর্যধারণ করুন এবং তাদেরকে উত্তম বর্জনে পরিবর্জন করুন। আপনি, আমাকে ও সম্পদশালী অসত্যবাদীকে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছুকাল অবকাশ দিন *(মুযযাম্মিল ১-১১)*।

আর এভাবেই আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। গুরু দায়িত্বভার বহন, পৃথিবীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন ও ইতিহাসের গতিপথকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য তিনি তাকে প্রস্তুত করেছিলন।

রাসূল (ছাঃ) গভীর রাত পর্যন্ত বিনম্রচিত্তে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছালাত আদায় করতেন। এমনকি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় তার পদযুগল ফুলে যেত, তবুও তিনি ছালাতে মগ্ন থাকতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর পা ফুলে যেত। অতঃপর একদিন তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন? তারপরেও আপনি এভাবে ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন কেন? তিনি বললেন, 'আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন কোন মাসে ছিয়াম ছেড়ে দিতেন তখন আমরা ভাবতাম তিনি মনে হয় আর ছিয়াম রাখবেন না। আবার কোন কোন মাসে একটানা ছিয়াম পালন করতেন তখন আমরা ভাবতাম তিনি মনে হয় কখনো ছিয়াম রাখা বন্ধ করবেন না। তুমি যদি তাকে রাতে ছালাতরত দেখ তাহলে দেখবে যে তিনি ছালাত আদায় করেই বলেছেন। আর যদি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাও তাহলে তাকে সেই অবস্থাতে দেখতে পাবে *(বুখারী)*।

সুতরাং আমাদের ভেবে দেখা উচিৎ রাসূল (ছাঃ)-এর ইবাদতনিষ্ঠা কেমন ছিল এবং কিরূপ ক্লান্তিহীনভাবে তিনি ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত, যিকির-আযকার, তাছবীহ-তাহলীল, ছিয়াম ইত্যাদি সম্পাদন করতেন।

ছাহাবী ও যুবকদেরকে ইবাদতের প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর উৎসাহ দান :

হে যুবকদল (জেনে রাখ)! রাসূল (ছাঃ) ছালাত-ছিয়ামসহ যাবতীয় ইবাদতের প্রতি ছাহাবীগণকে উৎসাহিত করতেন, পাশাপাশি ইবাদত করার নির্দেশ দিতেন। এছাড়াও তাদেরকে ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হতে বলতেন, তা (ইবাদত) বৃদ্ধির নির্দেশনা দিতেন, ইবাদতের উপকারী দিকগুলো শিক্ষা দিতেন এবং অলসতা সম্পর্কে সতর্ক করতেন। সুতরাং রাসূল (ছাঃ) কিভাবে সাহাবায়ে কেরামকে ইবাদত শিক্ষা ও নির্দেশনা দিতেন তা জানতে নিম্নোক্ত হাদীছগুলো পড়-

▪ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাঃ) এক রাতে তার (আলীর) ও ফাতেমার কাছে গমন করলেন। অতঃপর উভয়কে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা কি ছালাত আদায় করছ না?' *(বুখারী ও মুসলিম)*

▪ সালেম বিন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর খাত্তাব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ কতইনা ভালো মানুষ হত যদি সে রাত ছালাতে কাটাতো'। সালেম বলেন, 'এরপর থেকে আব্দুল্লাহ রাতে প্রায় ঘুমাতো না বললেই চলে' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

▪ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ওহে আব্দুল্লাহ! তুমি এমন ব্যক্তির মত হয়োনা, যে রাতে জাগে অথচ ছালাত আদায় করে না' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

▪ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হল যে সূর্যোদয় পর্যন্ত ঘুমাত। তখন তিনি বললেন, 'ঐ ব্যক্তির দুই কানে শয়তান প্রস্রাব করে'। অথবা তিনি বললেন, 'এক কানে' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

▪ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো কারো কাঁধের পেছনভাগে শয়তান তিনটি গিট মারে যখন সে ব্যক্তি ঘুমিয়ে থাকে। প্রত্যেকবার গিট মারার সময় শয়তান বলেন, রাত পোহাবার অনেক দেরী আছে, ঘুমাও'। অতঃপর যখন সে ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে, তখন একটি গিট খুলে যায়, যখন অযূ করে তখন আরেকটি গিট খুলে যায় এবং যখন সে ছালাত আদায় করে তখন শেষ গিটটি খুলে যায়। ফলে সে সকালে বেশ প্রফুল্ল ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। আর যে ব্যক্তি ঐ কাজ তিনটি করে না সে সকালে আলস্য ও স্বাচ্ছন্দহীনতা অনুভব করে' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

▪ আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, হে মানব সকল, তোমরা সালামের বিস্তার ঘটাও, (দরিদ্রকে) খাদ্য খাওয়াও এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন রাতে ছালাত আদায় কর। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(তিরমিযী)*।

উপরোক্ত হাদীছ ও আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র আদেশ পালন, গভীর রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী, ছাহাবীগণকে ইবাদতের শিক্ষা দান, তাদেরকে উৎসাহিতকরণ ও ইবাদতের দিকনির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমেই সর্বোচ্চ আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন।

সুতরাং উল্লিখিত আলোচনায় সকল শিক্ষক ও আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানকারীর জন্য একটি শিক্ষা রয়েছে। তাহল নিজে পালন করে অপরকে তা পালন করতে বলা এবং এমন কিছুর প্রতি মানুষকে আহ্বান না করা যা আত্মকল্যাণের বিপরীত হয় অথবা নিজের ধ্বংস ডেকে আনে। কেননা এরূপ কর্মকাণ্ড আল্লাহ অত্যন্ত অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ, নিজেরা যা করো তা মানুষকে বল কেন। আল্লাহ্র কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় যে, তোমরা যা বল, তা করনা' *(ছফ ২৩)*।

অত্র আলোচনায় আমাদের জন্যেও একটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তা হচ্ছে, রাত্রে ছালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করা, কুরআন পাঠ করা ও যথাযথভাবে উপলব্ধি করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত এবং ইবাদত হচ্ছে ঈমান, শিক্ষা ও প্রতিপালন, হেদায়াত এবং দায়িত্বভার বহনে দৃঢ়চিত্ততার পাথেয়।

রাতের ছালাত (তাহাজ্জুদ) ও ইবাদতে এগুলো ছাড়াও আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। আবু উমামা হতে বর্ণিত তিনি বরেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রাতের ছালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করা তোমাদের জন্য আবশ্যক। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মশীলগণ তা পালনে অভ্যস্ত ছিল। আর তা তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম, পাপ মোচনের কাফফারা এবং পাপ থেকে নিষেধকারী' *(তিরমিযী)*।

(সংক্ষেপায়িত)

Eve-teasing and a search for the solution

Zahidul Islam

Eve-teasing is a slang language of sexual harassment related to the female and quite publicized due to its progressive and depressing effect on the society. It is day by day prevailing throughout the country with its gruesome effect that has already made all the philanthropists and the government so concerned about how they can totally eliminate it from the country so as to ensure that the girls will no longer fall victim to it and will live in safety with their respective rights. This is why so many numbers of processions, rallies, conferences, discussions, written articles in all the dailies, TV programs broadcast with the electric media and other campaigns are taking place across the country.

To technically define eve teasing, it comprises two wards; one is eve used to mean our first mom Hawa (A) as described in the Bible and another is teasing which is the synonym of annoyance. In view of practical terms, it refers to making the girls annoyed or embarrassed by the poor minded persons who laugh at the attractively dressed and lovely girls and make jokes with them in a coarse way or express vulgar attitude towards them, even sexually assault upon them to mitigate their sensuous appetite after a failed trial to persuade them to have petting.

The girls who are ever so beautiful in their youth and reveal their appearance or beauty to others while walking outside on their way to schools, markets, workplaces etc. typically fall victim to eve teasing. Their ill dress, sensual attitude, free movement with the boys, conversation with dulcet tone-all these types easily provoke the teenagers to be attracted and result in teasing the girls by them as those girls are the representatives of the devil. To say the truth, that they move around in the figure of the devil bears witness to the statement of the Prophet (Sm) where he says: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُوْرَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُوْرَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَةٌ فَوَقَعَتْ فِى قَلْبِه فَلْيَعْمَدْ إِلَى إِمْرَأَتِه فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِه. "Woman comes in the posture of the devil and goes back in his figure. While a woman attracks someone of you and she appears at his heart, he had better come to his own wife and have intercourse with her because that must vanish what exists inside him *(Muslim, Mishkat H\3105*). Anyway, when the degree of attraction is so acute the girl-addicts fall in love with those girls, eventually rape them in case of denial. Among them especially bad tempered students, unemployed boys, rickshaw pullers and drivers throw piles of abuses towards those girls to goad them. These are very prevalent features of hateful eve teasing being caused by such a group of boys with the girls who have no moral and religious knowledge as well. It is the most significant point that no boys or girls who lead Islamic lives have got vulnerable to or been accused of the crime so far. Accordingly dear readers, therein lies what would be the causes and the solution to the problem.

Not any single class of the people is responsible for it, but people of different races and other attributes are the main culprits in cultivating eve-teasing for example, some parents along with their issues, existing superstition, sophisticated culture, co-education with coarse movement among the young, decline of moral and religious passion and taking the restrictions and regulations issued by Allah under no implementation. Some parents enthuse their sons or daughters to be shameless in the spheres of dancing, singing, making fun with their counterparts simply raising an excuse of friendship and

entertainment whereas shame is such an overarching asset to the humans that is capable of preventing one from a sin, therefore it is called a brunch of Iman *(Muttafaqun Alaih, Mishkat, H\03)*.

In this way, blatant movement in almost every educational institution, shopping malls, recreational functions and other domains has been available in the extreme. In addition, a great number of mobile phones, musical instruments, CDs, VCDs, DVDs, Facebook, Internet etc. whereat nakedness is all along available for the oor minded young, has been added to the collapse of our society. All the afore-mentioned aspects rekindle romantic passion of the young who have no knowledge at all over the restrictions of Islam; as a result, they commit crimes like eve-teasing, ultimately assault upon the girls either with agreement or disagreement.

To depict the consequence for that, it is beggar's description to express how much severe it is and how it damages one's virginity, gets one depressed, sometimes inspires to commit suicide. In these days, the female are not as respected in our surroundings as they would be in the golden age of Islam. They are instead made to suffer from uncertain chastity and they are to drop out of their workplaces, schools and so on, thereby being deprived of well education, livelihood etc. and remaining illiterate and unemployed. Many a man or woman is to dedicate his life owing to protest against eve teasing and in the meanwhile, a great number of parents, brothers, other relatives, neighbors and bosom persons have been killed by the miscreants while stepping forewords to save their dear ones. Such events are so much heart rending that cannot be expressed in words, as it is merely a matter of feeling through nothing but the psyche. Let's have a short glance on the following survey published in the daily Amar Desh. During last year, the number of the victims to eve teasing is 434 girls and suicide committers are 28 with more 12 persons who lost their lives due to protest against it *(1st page, 25 November 2010)*. Out of them, the suicide of Pingki, Elora, Prova, Rupali, and Jaba is most notable here amongst the deceased on account of protest, the names of Chapa Rani Vowmic, Sadekur Rahman with his wife Roman Nurgis, master Mizanur Rahman and Harun are most familiar to all. Anyway, barely on last October, 40 girls were victims to it and 26 were raped *(page no.6, 3-11-10)*.

The government body being forced by the people from all walks of life to solve the case is altogether busy with the issue and has been committed to deal with it through the power of the state constitution but it is a matter of enquiry how far they would be triumphant in their campaigns. On the contrary, the constitution has a lack of a certain anti-eve teasing law; though there are few related laws, for instance, article no.509 in penal code, article no.10 over trafficking in women and

children and article no.76 in metropolitan police ordinance in 1976. Some more strategies have been appended to them namely mobile court, jail sentence for---months with tk.---as fine etc. yet even worse pathetic phenomenons of eve-teasing are still breaking out. Have the wicked stopped their misdeed in the fright of punishment?

In the recent years, eve teasing seems to stay beyond control but won't it be eliminated anyhow?—that is more than questionable to the concerned who are, we can precisely distinguish seeing those pursuing too much talking about it in the electric or print media, in deep meditation with a view to devising up the perfect solution after their failure to elevate it to a certain extent in spite of having enacted piles of anti-eve teasing laws. This state of theirs will never exhaust as long as they indulge in the enforcement of laws enacted by themselves irrespective of Allah's restrictions.

Allah says, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً. 'Oh prophet, tell your wives, daughters and the women of the believers to draw their cloaks close round them (when they go abroad). That will be better, so that they may be recognized and not teased. Allah is ever forgiving, merciful' *(Sura Al-Ahzab 59)*. In another verse, he says قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ "Tell the believing men to lower their gaze and be modest. That is purer for them. Lo! Allah is aware of what they do *(Sura An Nur-30)*. He urged to lower the gaze not only of men but also women, for exampl,e وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ 'And tell the believing women to lower their gaze and be modest` *(Sura An Nur-31)*. So everybody ought to keep his gaze below no matter weither he is a man or a woman and this is an effective bar to what might awake latter in one's mind. The Prophet (sm) says, "Adultery of human eyes is to see through, of ears is to hear, of tongue is to taste with, of heart is to cherish it and the genitals proves the truth or falsehood" *(Muslim, Miskat H-86)*. Given the above statement, how can one commit those types of adultery as long as he keeps the teachings of the hadith under every implementation? Besides, there must not be any possibility for eve teasing to be committed in the long run. The prophet (sm) further says ''the evil acts as third person when a male and a female get together in a lonely place *(Tirmiji, Sanad Saheeh, Mishkat H-1318)*. It denotes that the evil stimulates them to commit sins. In our surroundings, it has been a very common feature that the boys and the girls spend their time sitting closer to each other in parks, forests and other congenial places.

Apart from the above references, there are, however, a great deal of quotations in the holy Quran and the authentic Hadith of the Prophet (sm) that can exactly direct us to the perfect solution to the problem. The pivotal treatment against eve-teasing is the cultivation of Taqwa (fear in Allah) which is definitely capable of keeping boys and girls away from all sorts of sins or crimes as well as guiding them to the ultimate success both here and hereafter. So taqwa, the indispensable adaptation must be inculcated in each human being and we can expect the long cherished society afterwards; a society where men and women would live in peace and comfort having their respective rights, abide by Allah's orders-prohibition etc. and wouldn't encroach upon others' rights, respects and so on. Thus all types of major or minor difficulties would be effectively solved simply with the help of taqwa. Accordingly, it can be precisely stated that taqwa and fully obedience to the Creator had better be optimized as the catalyst for the removal of eve-teasing. May Allah give that taqwa in all of us. Ameen!!

---0---

জীবনের বাঁকে বাঁকে

বগুড়া জজকোর্টে

-শেখ আব্দুছ ছামাদ

২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন যেলায় প্রায় ডজন খানেক মিথ্যা মামলা দেখিয়ে তিনজন সাথীসহ তাঁকে গ্রেফতার করে তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকার। অবশেষে অধিকাংশ মামলায় অব্যাহতি নিয়ে তিনি ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে কারামুক্ত হন। *ফালিল্লাহিল হামদ্।* জেল থেকে বের হওয়ার পর প্রায় প্রতি মাসেই মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে নওগাঁ ও বগুড়া কোর্টে হাজিরা দিতে হয়। কিন্তু তাঁর সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য আমার কোনদিন হয়নি। বিগত ৩০ সেপ্টেম্বর সকালে হঠাৎ আত-তাহরীক সম্পাদক বড়ভাই ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের কল। রিসিভ করার সাথে সাথে অপরপ্রান্ত হতে নির্দেশ পেলাম 'আজ মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে বগুড়ার গাবতলীতে দায়েরকৃত বিস্ফোরক মামলার রায় হবে, তোমাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বের হয়ে সাথে যেতে হবে'। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তড়িঘড়ি বের হয়ে পড়লাম। সকাল সাড়ে ৮-টায় গাড়ি বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। বেলা সোয়া ১১-টায় আমরা জজ কোর্ট চত্বরে পৌঁছালাম। বগুড়া যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'র নেতা-কর্মীবৃন্দ পূর্ব থেকেই সেখানে অপেক্ষমাণ ছিলেন। মামলার রায় বলে উপস্থিতি অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি। সবাই আমাদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করছেন, এমন সময় শতবর্ষী দু'জন বৃদ্ধের প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। সহসাই মনে প্রশ্নের উদ্রেক হল, এই অচল মুরব্বী দু'জন কেন কোর্টের বারান্দায়? পাশে দাঁড়ানো সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করতেই জানতে পারলাম, উনাদের একজনের নাম জসীমুদ্দীন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সেই ২০০৫ সাল থেকে যতদিন এই আদালতে উপস্থিত হয়েছেন ততদিন তিনি নিয়মিত হাজির হয়েছেন এবং মহান আল্লাহ্র দরবারে আমীরে জামা'আতের মুক্তির জন্য প্রাণখোলা দু'আ করেছেন। অপরজন বৃ-কুষ্টিয়ার আব্দুর রহীম। পৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় দাঁড়িয়েও তার মেরুদণ্ড দিব্যি সোজা। মুরব্বী দু'জনকে নীচ তলায় রেখে আমরা তৃতীয় তলায় বগুড়ার 'অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-১'-এর এজলাসে গেলাম। আমীরে জামা'আত পার্শ্বের একটি কক্ষে কয়েকজন সঙ্গীসহ অপেক্ষা করতে থাকলেন। আর আমরা ছিলাম সম্মুখ বারান্দায়। এমন সময় হঠাৎ দেখি মুরব্বী আব্দুর রহীম সাহেব তৃতীয় তলায়। তাকে দেখে রীতিমতো আমার চোখ ছানাবড়া। তাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না-'চাচাজি! আপনি সিঁড়ি বেয়ে এখানে এলেন কিভাবে'? তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিলেন- 'বাবা! আমীরে জামা'আত এখানে রায়ের অপেক্ষায় থাকবেন আর আমি নীচে বসে থাকি কিভাবে? আমি ভালভাবেই উপরে উঠতে পেরেছি। আমীরে জামা'আতের মুখখানা এক নজর দেখতে পেলে কোন কষ্টকেই আর কষ্ট মনে হয় না'। এ কথা শুনে মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ! এমন মানুষ এখনো তোমার যমীনে বিদ্যমান আছে! সত্যিই এমন ব্যক্তির অশ্রুসিক্ত ও দু'আর বদৌলতেই হয়ত এতো ষড়যন্ত্র আর বিপর্যয়ের মুখেও আল্লাহ আমীরে জামা'আতকে আর আমাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠনকে যমীনের বুকে আজও টিকিয়ে রেখেছেন।

এ কথা ভাবতে ভাবতে দেখি কারাগার হতে একটি প্রিজন ভ্যান নীচে এসে দাঁড়াল। ভিতর থেকে নেমে এল হাতে-পায়ে বেড়ি পরানো দু'জন দাড়ি-টুপি ওয়ালা আসামী। জানতে পারলাম, তাদের একজনের নাম জয়নাল যার বাড়ীতে প্রাপ্ত বিস্ফোরক দ্রব্যকে কেন্দ্র করেই এই মামলার সূত্রপাত। অপরজন শফীকুল্লাহ যাকে জয়নাল সাহেবের বাড়ী থেকে গ্রেফতার করা হয়। কথিত জেএমবির আসামী হওয়ার কারণে তাদেরকে স্পেশালভাবে বিশেষ প্রহরায় আদালতে আনা হয়েছে। তাদেরকেও যথারীতি 'অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-১'-এর এজলাসে হাযির করে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রাখা হল। ইতিপূর্বে সেখানে কোন পুলিশ উপস্থিত না থাকলেও তাদেরকে নিয়ে আসার সাথে সাথে এজলাসের ভিতরে ও বাইরে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরায় নিয়োজিত হল। বেলা সাড়ে ১১-টা হতে একটানা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকার এক পর্যায়ে বেলা পৌনে ৩-টার দিকে আসামী জয়নালকে এজলাসের পার্শ্বে অবস্থিত টয়লেটে নিয়ে যাওয়া হল। বাইরে বের হতে দেখে তার অশীতিপর মা, স্ত্রী ও সন্তানেরা পাশে এসে দাঁড়াল। টয়লেট হতে বের হতেই তার বৃদ্ধা মা তাকে স্নেহের বাহুডোরে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। মাতৃস্নেহের এ চিরন্তন দৃশ্য পৃথিবীর সেরা সন্ত্রাসীর জন্যও নিমিষেই মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। এ দৃশ্য দেখে কোন হৃদয়বান মানুষের পক্ষে চোখের পানি ধরে রাখা কঠিন। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

একই রকম মানবিক দৃশ্যের অবতারণা দেখি পার্শ্ববর্তী কোর্টে। এক মামলার আসামী হয়ে কোর্টে এসেছেন দুই সহোদর। হয়ত কোন এক কারণে দু'ভাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটেছিল, যা এক পর্যায়ে পরস্পর বিরোধী মামলায় রূপ নেয়। আজকের রায়ে বিচারক তাদের মধ্যে আপসের নির্দেশনা দিলেন। অতঃপর উভয়ে উভয়ের গলা জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে

এজলাসের বাইরে এল। প্রথমে এ দৃশ্য দেখে মনে হল হয়তো বিচারের রায় বিপক্ষে যাওয়ায় তারা এভাবে আহাজারি করছে। কিন্তু যখন আসল ঘটনা জানতে পারলাম তখন মনে পড়ল বহুল প্রচলিত সেই প্রবাদের কথা। 'ভাই বড় ধন রক্তের বাঁধন, যদিও পৃথক হয় নারীর কারণ'।

যাইহোক আমীরে জামা'আতের মামলা পরিচালনাকারী মাননীয় জজ শাহিনা নিগারের কথাও একটু না বললেই নয়। ঢাকা থেকে সড়ক পথে জার্নি করে বগুড়া এসে বেলা ১১-টা হতে সাড়ে ৩-টা পর্যন্ত কোনরূপ বিরতি ছাড়াই যেভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করছিলেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁর ধৈর্য দেখে প্রথমেই মনে হয়েছিল যে, আজকে হয়তো সঠিক বিচার পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ্। পরবর্তীতে হলও তাই। ন্যায়পরায়ণতার কথা বাদই দিলাম, এভাবে যদি বাংলাদেশের বিচারকগণ শুধুমাত্র তাদের দায়িত্বশীলতার পরিচয়টুকু দিতেন তাহলেও দেশের আদালতগুলোতে বছরের পর বছর মামলার স্তূপ জমে থাকত না এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আইন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে বর্তমানে দেশে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ১১ লাখ ২৫ হাযার ৯০৪টি। আদালতগুলোতে প্রতিদিন যে হারে মামলা নথিভুক্ত হয় তার এক দশমাংশও নিষ্পত্তি হয় না শুধুমাত্র বিচারকদের দায়িত্বে অবহেলার কারণে। ফলে এদেশের বিচারব্যবস্থা এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, এক পর্যায়ে বাদী-বিবাদী উভয়ই মারা যান কিন্তু মামলা নিষ্পত্তি হয় না।

এদিকে আমীরে জামা'আতের মামলার রায় হবে জানতে পেরে সকাল থেকেই আদালত চত্বরে বহু সাংবাদিকের ভিড়। সাংবাদিকদের দেখলেই এখন কেমন যেন বিতৃষ্ণা জাগে। গত তিন বছর যে ন্যক্কারজনক অভিজ্ঞতা হয়েছে এ ক্ষেত্রে, তাতে সাংবাদিকতা পেশার প্রতিই দারুণ অশ্রদ্ধা জন্মেছে। তাই যথাসম্ভব তাদের এড়িয়ে চলছিলাম। কিছুটা উৎকণ্ঠায় ছিলাম আজ রায় হবে তো! অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ হল। বেলা ৩-টা ২০ মিনিটে উকিল সাহেব এজলাস হতে বের হয়ে বললেন, 'রায় হয়ে গেছে মামলার সকল আসামী বেকসুর খালাস'। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর চার মাস তদন্ত ও শুনানীর জটিল পথ পেরিয়ে পরিশেষে কাঙ্খিত এই রায়। একদিকে একরাশ উৎফুল্লতা হৃদয়জুড়ে ছুটোছুটি করছিল, অন্যদিকে আক্ষেপটা নতুন করে ঝাড়া দিয়ে উঠল। অযথা এই ডাহা মিথ্যা বিষয়ে কত মানুষেরই না বিপুল সময় ও অর্থের শ্রাদ্ধ হল। কেন মিথ্যার পিছনে এত ছুটাছুটি। সভ্য জগতে মিথ্যার এ জয়জয়কারের সামনে ন্যায়বিচারের গল্প বড়ই ব্যঙ্গাত্মক শোনায়। যাইহোক রায় শোনামাত্র মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে আমরা দু'রাক'আত শোকরানা ছালাত আদায় করলাম। পরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে ছবর ও সত্যের প্রতি অটল থাকার উপর এক হৃদয়গ্রাহী সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার এক পর্যায়ে উপস্থিত সকলে কেঁদে ফেললেন। 'সত্য সমাগত, মিথ্যা বিতাড়িত, আর মিথ্যা বিতাড়িত হওয়াই বাঞ্ছনীয়' *(বনী ইসরাঈল ৮১)*।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রান্তিক মানুষ

- আব্দুল হক্ব

ফজর আলী নবতিপর বৃদ্ধ। ছিপছিপে দেহ। পরনে সফেদ পাঞ্জাবি। আবক্ষ সাদা দাড়ি। আদ্যন্ত সাদা জীবন। কিন্তু এ জীবন তিনি আর যাপন করতে চান না। চান না সতেরো বছর ধরে। তবু বেঁচে আছেন। দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুর সঙ্গে বেঁচে আছেন। না, তিনি ভিখিরি নন। জীবন অবাঞ্ছিত হয়ে ওঠার কারণ দৈন্য নয়। ঢের জমিজমা আছে। পাঁচ ছেলের একজন মালয়েশিয়ায়। বাকিরাও রোজগেরে। সবাই পিতাঅন্তপ্রাণ। তবু ফজর আলি কাঁদেন। তবু চোখ তাঁর শুকোয় না। তিনি ছেলেদের ভালোবাসেন। নাতি-নাতনিদেরও। শুধু নিজের জীবনকে বাসেন না। কারণ প্রেম। কারণ বিরহ। কারণ চল্লিশ বছর আগে একজন তাঁকে ভালোবেসেছিলেন। একজন তাপস। মনফর উদ্দীন। দূরাগত। পণ্ডিত দরবেশ। তিনি তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। ভালোবেসেছিলেন। সেই বাসা কেমন, আমরা দেখি নি। তবে তার ছায়া দেখেছি। ফজর আলির অশ্রুধারায় দেখেছি। ফজর আলির গানের সুরের আকুলতায় দেখেছি। ফজর আলির চল্লিশ বছর ধরে কলাপাতায় ভাত খাওয়ার নিষ্ঠার নেপথ্যে দেখেছি। চল্লিশ বছর আগে ধোপদুরস্ত ফজর আলীকে তাঁর পীর থালার বদলে পাতায় খেতে বলেছিলেন। সেই বলা আর রদ করে যান নি। তাই তিনি পাতায় খান। হতে পারে আদেশ তুলে নেবার খেয়াল ছিল না। অথবা ছিল, কিন্তু মুমূর্ষু সময় ফুরসত দেয় নি। ফজর আলী ওসব ভাবেন না। এ নিয়ে তাঁর খেদ নেই। তিনি চল্লিশ বছর ধরে তৃপ্তির সঙ্গেই পাতায় খান। এ ভক্তির তৃপ্তি। গল্পপট ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা। কলুংকা থেকে শুনই...মাইলের পর মাইল। চীনামাটির টিলা কোনখানে, কোথায় কুমিরের খামার..দেখা হয় নি। হেঁটেছি কেবল, সোনালি খড়ের মেঠোপথে, ধুলো-কুয়াশায় মাখামাখি হয়ে। কেবল মানুষ দেখেছি। ছুটেছি বাড়ি বাড়ি। শুনতে চেয়েছি এইসব ফজর আলীদের হৃদয়ের কথা। আত্মার আরতি। রাঁধা-খাওয়ার বাইরে এদের একটাই আত্মিক অনুষঙ্গ : ধর্ম। ইসলাম। কিন্তু গ্রন্থগত ইসলাম নয়, ঐতিহ্যগত সূফীবাদ। কেতাবি চোখে তাতে ঢের বিভ্রম। শিত্রের ঠমক যেটুক দেখলাম, তাও ঐ ধর্মচর্চার ভেতরেই। আল্লাহ্র আরাধনা, পীরের ভক্তি..সবই গানে।

সন্ধ্যেয় সবাই ঢোল-তবলা নিয়ে পাক-পাঞ্জাতনের মোমবাতি জ্বেলে গোল হয়ে বসে, অতঃপর গানের পর গান, পিতা-পুত্র একসাথে, সমস্বরে। বুড়ো লাল মিয়া বয়সের ভারে সিধে হয়ে হাঁটতে পারেন না, কিন্তু আসরে তাঁর গানের গলা শুনে মুগ্ধ হয়ে যাই। টের পাই, গান এদের স্রেফ বিনোদনমাধ্যম নয়। এদের আসরে অন্য আবহ, মুখে মুখে কী এক গায়া, চোখে জল। কেতাবি মন তবু উসখুস করে, কী উদ্ভট! কীসের পাক-পাঞ্জাতন! কোথাকার পীর! কবিমন বলে, রাখো তোমার কেতাব! হৃদয়ের রং দেখো, এর চে' বড় তো কিছু নেই। এই দ্বন্দ্বে বদ্ধ হয়ে থাকি। ভাবি। এরা ভুলে ডুবে আছে। কিন্তু শান্তিতে আছে। শুদ্ধতা তো শান্তির জন্যে।

কিন্তু শুদ্ধতা শুধুই কি শান্তির জন্যে? না। সত্যের উদ্বোধন, আত্মার জাগৃতি, ইনছাফের প্রতিষ্ঠার জন্যেও। কম পীরই সার্থক, বেশি তো সার্থক। স্বার্থপীরের চাতুর্যের কাছে ভক্তের সারল্য শোষিত হয় সহজে, নিরাপদে। ভক্তকে বিশ্বাস করানো হয়, পীরের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রবল। তিনি সবই জানতে পারেন, ভক্তের মনের খবর তো বটেই। তাই পীর যখন অলৌকিক কারণ দেখিয়ে নযরানা চান, মুরিদ এর ফাঁকিটা ধরতে চেষ্টা করে না। ভাবে, পীর বুঝে ফেলবেন, সে সন্দিহান। কী সর্বনাশ! তওবা, তওবা! এভাবেই মূর্খ-চতুর পীরদের ব্যবসা চলে অবাধে। ভক্ত এদের হাতে সাধ্যমতো সব তুলে দিয়ে ভাবে, তার ইহজন্ম সার্থক হল। ভেবে শান্তি পায়। ভ্রান্তির শান্তি! শান্তি কাঙ্খিত, কিন্তু ভ্রান্তি স্বীকার্য নয়। দ্রোহী তারুণ্যের তর সয় না। সে তার সত্যবাদ নিয়ে ভুল ভাঙতে উদ্যত হয়। প্রাজ্ঞ সহজন থামিয়ে দেন। দিশে পাই...সত্য কোনো হাতুড়ি নয়, যার ঘায়ে তুমি মানুষের আবেগকে আহত করবে। হিকমা, সুন্দর বক্তৃতা, গঠনমূলক বিতর্ক। সত্য প্রচারের এ তিনটে পথ, মহাসত্যেরই দেখানো পথ। এখানে প্রথম পর্যায়ে প্রথমটা নিতে হবে। আঘাত করে ভাঙা যায়, জাগানো যায় না। এদের জাগাতে হবে। জাগাতে হবে প্রেম দিয়ে। মমতা নিয়ে দাঁড়াতে হবে হৃদয়ের কাছে। বোঝাতে হবে- আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য নেই। আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি। তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। তাই শুধু তাঁরই ধ্যান করব। তাঁকেই জ্ঞান করব রক্ষাকর্তা বলে। তিনি অন্তর্যামী, তাঁকে ঘিরে কেন্দ্রিত হোক আমাদের মন। ইন্নী ওয়াজ্জাতু বিশ্বকর্তার উদ্দেশ্যে।

'পীর' ইসলামী পরিভাষা নয়। শব্দটির অর্থ- 'যে দৃশ্য ধারণ করে', তা-ও ইসলামসম্মত নয়। এটি আর্য ঋষির পারসিক মূর্তি। পীর ও ঋষিদের কথা আমরা যেমন শুনি, তাতে বৈরাগ্য আছে। আছে সংসারবিমুখতা। ইসলাম তা শেখায় না। কুরআনের দর্শন বিরাগী নয়, অনুরাগী। ইসলামের সবচে' বড় প্রচারক মহানবী মুহাম্মদ (ছাঃ) নবুওতের দায়িত্ব নেবার পর একদিনও সমাজবিচ্ছিন্ন ছিলেন না। ধর্ম তো মানুষের জন্যে, কাজেই মানুষকে বাদ দিয়ে যে সাধনা, তা অমানুষিক সাধনা। ইসলাম বলে কল্যাণ সাধনের কথা। দেহ-মনের কল্যাণ, সমাজ-রাষ্ট্রের কল্যাণ। ইসলামী চিন্তা ও কাজ মানেই মানবকল্যাণমূলক চিন্তা ও কাজ। যে চিন্তায় মানুষ নেই, তা শয়তানী চিন্তা। যে কর্মে জীবনের স্বার্থ নেই, তা নিছকই অপকর্ম। মুসলমানরা ইলমে কালাম ও তাসাউফের নামে কয়েকটি শতাব্দী এই অপকর্মের সাধনায় নষ্ট করেছে। এরই বিষফল পণ্যায়নের পৃথিবীতে তারা আজ ভোক্তা-ক্রেতা-শোষিত। এরই পরিণামে ফেরকা-তরীকার দ্বন্দ্বে সরল-সঠিক ইসলাম আড়াল হয়ে পড়েছে। নষ্ট করার সময় আর নেই। মানুষের কথা ভাবতে হবে। মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। এ লেখার প্রেক্ষাপট খুব দুর্গত অজ্ঞ সেই সব মানুষ যাদের জীবনমান নিচু। এদের শুদ্ধ তাওহীদ ও জীবনবোধ শিক্ষা দিতে হবে। যুবকদের সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী কাজ দিতে হবে। এই একুশ শতকে, যখন জীবন ছড়িয়ে গেছে বহুদূর, ছুঁয়েছে বিশ্বজনীন মাত্রা। তখন আর সাবেকী পীরপ্রথার জপতপের অবকাশ নেই। সময় যত এগিয়েছে, তার দাবিও বেড়েছে ততটা। আজকের দাঈ ইলাল্লাহ হবেন মানবতাবাদী, অভিজ্ঞ ও তৎপর সমাজকর্মী। হিদায়াতের আলো পৌঁছে দেয়ার কাজে তিনি হিকমা প্রয়োগ করবেন। সেজন্য সবার আগে চাই মানুষের জন্য মমতা। পাণ্ডিত্যে দু'টি জিনিসের একটি নিশ্চিত থাকবে- হয় প্রেম, নয় অহঙ্কার। প্রেমহীন পাণ্ডিত্য সেই রসহীন মাটি, যাতে প্রাণের অঙ্কুর উদ্গত হয় না। আমাদের এ উপলব্ধিটা আরো প্রকৃষ্ট হয়ে ওঠে, যখন বক্ষ্যমাণ জনপদের জন্যে যথার্থ কর্মনীতি অবধারণ ও অংশগ্রহণের আহ্বান নিয়ে একদল আলখাল্লাধারীর দ্বারগত হই। তাদের পাণ্ডিত্য বিমুখ হয়। বিমুখ হয় শুধু আমাদের থেকে নয়, আমাদের রবের সেই বাণী থেকেও, যা বিমুখ হতে স্পষ্টত বারণ করে বলে 'তুমি অহংকারমত তোমার মুখ মানুষের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেয়ো না' *(লোকমান ১৮)*। চোখে দেমাগের ঠুলি আঁটা বলে তারা তা দেখে না। মানুষকে সত্য ও সুন্দরের দিকে আহ্বানের জীবনমুখী চেতনা নেই বলেই তারা বলে, এসব গোমরাহ লোকের পেছনে মেহনত করে লাভ হবে না। আল্লাহ না চাইলে কাউকে হিদায়াত করা যায় না। শুনে স্তব্ধ হয়ে থাকি। কিছুই বলি না। শুধু হিদায়াতদাতার কাছে কায়মনোবাক্যে বলি, আল্লাহ তুমি আমাদের বুযুর্গদের মানুষ হবার তাওফীক দাও আর আমাদের ভিতর থেকে একদল লোককে জাগিয়ে দাও যারা তোমার দ্বীনকে দিক-দিগন্তের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারে। আমীন

Contents

সামাজিক মানুষের সহজাত প্রতিক্রিয়া ও ইসলামী বিচারব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা

-হিযবুল্লাহ আল-গালিব

ইভটিজিং-এর প্রতিবাদ করায় নাটোরের কলেজ শিক্ষক মিজানুর রহমানের হত্যাকারী দুর্বৃত্ত রাজনের কি ধরনের শাস্তি হওয়া দরকার এ নিয়ে শীর্ষস্থানীয় জনপ্রিয় এক বাংলা সামাজিক সাইটে ব্লগারদের যে সব মন্তব্য উঠে এসেছে তার নমুনা এমন- 'না মরা পর্যন্ত গণধোলাই'...'সব অঙ্গ এক এক করে কেটে ফাঁসিতে ঝুলাতে হবে'...'সবার সামনে গুলি করে মারা কিংবা একবারে কতল'...'ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মারা উচিৎ এবং সেটি সকল টেলিভিশনে বাধ্যতামূলক লাইভ টেলিকাস্ট করা হোক। আমি প্রশাসনে থাকলে সেটাই করতাম'....'জনসম্মুখে ফাঁসি চাই। তার আগে মুক্ত গণধোলাই'....'মিজানকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে সেভাবে হত্যা করা হোক'...'ডগ স্কোয়াডে দিতে হবে এবং কামড় খাওয়াতে হবে না মরা পর্যন্ত'... 'যতদ্রুত সম্ভব মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করতে হবে'... ট্রাকের পিছনে দড়ি বেঁধে সারাদেশে ঘুরাতে হবে যাতে তার বীভৎস চেহারা দেখে কেউ এমন কাজ করার আর চিন্তাও না করে। আমার ক্ষমতা থাকলে খোদার কসম আমি তাই করতাম ঐ ঘৃণ্য নরপশুদের'...'প্রকাশ্য জনসম্মুখে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা উচিৎ যাতে ভবিষ্যতে আর কোন নরপশুর জন্ম না হয়'...। আরো যে সব মন্তব্য রয়েছে তা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়।

উপরোক্ত মন্তব্যগুলো পড়লে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় এ মর্মান্তিক ঘটনা মানুষের মনে কিরূপ তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। এমন কোন উচ্চতম শাস্তির কথা অবশিষ্ট নেই যা মন্তব্যদাতারা উল্লেখ করতে কসুর করেছেন। অথচ তাদের কেউই কিন্তু নিহত মিজানের আত্মীয় বা পাড়া-প্রতিবেশী নন। নিতান্তই অপরিচিত এসব লোকজন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসব মন্তব্য করেছেন। একবার চিন্তা করুন, যে পরিস্থিতিতে একজন অনাত্মীয়-অপরিচিত ব্যক্তির অন্তরে নিহত ব্যক্তির জন্য এতটা প্রতিক্রিয়া জন্ম নেয় সেখানে নিহত ব্যক্তির যারা একান্ত পরিবার-পরিজন তাদের মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে? কত তীব্র হতে পারে তাদের প্রতিক্রিয়া? অবশ্যই অবশ্যই বহুগুণ বেশি। নিশ্চয়ই তারা কামনা করবেন তাদের কল্পনায় ভাসা সর্বোচ্চ শাস্তিটাই।

প্রিয় পাঠক, এবার চিন্তা করুন ইসলামী বিচারব্যবস্থার যৌক্তিকতা। সুস্পষ্টই এটা প্রতিভাত হবে যে, মানবপ্রবৃত্তির যে স্বাভাবিক দাবী তার মাঝেই ইসলামী বিচারব্যবস্থার আপাত কঠোর শাস্তি নীতির প্রাসঙ্গিকতা নিহিত। এখানে লক্ষ্যণীয় যে মন্তব্যদাতারা প্রত্যেকেই শিক্ষিত ও আধুনিক সুশীল সমাজের তথাকথিত মানবতাবাদী প্রতিনিধি এবং অধিকাংশই দাবী করেছেন যে, হত্যাকারীর শাস্তি প্রকাশ্য জনসম্মুখে কার্যকর করা হোক।

তাদের শাস্তির দাবীর পিছনে যে কঠোরতম এবং স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে, তা-ই আমার এ লেখার প্রেক্ষাপট। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার চরম উন্নতির যুগে তুমুল উৎসাহের সাথে হরহামেশাই প্রচারিত হচ্ছে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা যে কি রকম বর্বর তার প্রকাশ্য কিংবা আকার-ইঙ্গিতের বিবরণ। যারা কিছুটা সংযমী তারাও আল্লাহ্‌র আইনকে কেবল মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার জন্য উপযোগী ছিল বলে পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য করে নিজেদেরকে আধুনিক জাহির করেন। অথচ কেতাদুরস্ত বিতর্কের বাইরে বাস্তবে এসে উপরোক্ত ঘটনায় এই তাদেরই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহের ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কৃত্রিম খোলস

ঠেলে ক্ষণিকের জন্য হলেও তারা বাস্তবতার আলোয় একাকার হয়েছেন। একই সাথে ইসলামী আইন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকেও অবচেতনভাবে উচ্চকিত করেছেন।

মূলত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানুষের জন্য যে সকল নীতিমালা আবশ্যকীয় করে দিয়েছে তা মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর ও তাদের স্বাভাবিক চাহিদার অনুকূল। এ ব্যবস্থা সর্বকালের সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য ও মানব সমাজের শৃংখলাবিধানের সর্বাধিক উপযোগী বিধান। আপাত দৃষ্টিতে তা যত কঠোরই মনে হোক না কেন, তার অভ্যন্তরে মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক দাবী এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির যে সুসমন্বয় ঘটেছে তার কোন বিকল্প নেই। সমাজে প্রকৃত অর্থে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চাইলে এবং রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনাযন্ত্র পরিশীলিত, ন্যায়বিচারপূর্ণ কাঠামোয় উত্তীর্ণ করতে চাইলে এই বিচার ব্যবস্থাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে সমাজের পাদপীঠে। আল্লাহ আমাদের সুমতি দান করুন। আমীন!!

ভিনদেশের চিঠি

ফিলিপাইনের ইসলামী শহর আমার মাতৃভূমি মারাওয়ী সিটি

-খাদীজা আমাতুল্লাহ
মারাওয়ী সিটি, মিন্দানাও

পূর্বপ্রাচ্যের সর্ব দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের কোলে অবস্থিত ৭১০৭টি দ্বীপপুঞ্জের দেশ ফিলিপাইন। উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্ব আকৃতির এই দেশটির দ্বীপপুঞ্জগুলো মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত। উত্তরাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জের নাম লুজন। এটাই দেশটির সবচেয়ে বড় দ্বীপপুঞ্জ, যেখানে রাজধানী ম্যানিলা অবস্থিত। মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত ভিসায়াস। আর দক্ষিণাঞ্চলে মিন্দানাও। ষোড়শ শতকে বৃটিশ, পর্তুগিজ, জাপানিজ ঔপনিবেশিকরা এ দেশের বুকে পদার্পণের আগে দেশটি একটি মুসলিম দেশই ছিল। ঔপনিবেশিকদের সাথে আসা খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাবে ধীরে ধীরে দেশটি মুসলিম পরিচিতি হারিয়ে

মারাওয়ী সিটি

ফেলল। কিন্তু একটি অঞ্চল এই প্রভাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ফিলিপাইনের দক্ষিণাংশ জুড়ে প্রায় ১ লক্ষ বর্গকিলোমিটারের এই বিশাল অঞ্চলই হল মিন্দানাও দ্বীপ। মিন্দানাওবাসীদের নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষায় তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন সে যাত্রায় তাদের রক্ষা করে এবং মুসলিম পরিচিতি নিয়ে বসবাসের সুযোগ করে দেয়। এই কারণে আজও এখানকার অমুসলিমরা মুসলিমদের যথেষ্ট সমীহ করে এই ভেবে যে, তারা শক্তিশালী ও বিশ্বাসপরায়ণ। আমার মনে পড়ে আমার কাজিনরা যখন লুজন বা ম্যানিলায় লেখাপড়া করত (সে সময় খুব কমসংখ্যক মুসলিম সেখানে পড়তে যেত), তখন তাদের শিক্ষকরা বলত যে, আমরা মিন্দানাওয়ের মুসলিমদের নিয়ে খুব গর্বিত। কেননা তারা ঔপনিবেশিকদের হাতে নিজেদের ভাগ্য ছেড়ে দেয়নি। তাদের স্কুলে এরূপ নিয়ম ছিল যে, আইডি কার্ড বা ইউনিফর্ম না থাকলে কোন ছাত্রকে স্কুলে প্রবেশ করতে দেয়া হত না। অথচ দেখা গেছে আমার কাজিনদের কেউ ভুলবশত কোনদিন আইডি বা ইউনিফর্ম ছেড়ে আসলে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হচ্ছে, যদিও একই সময়ে অন্যদের দেয়া হচ্ছে না। এটা এই কারণে যে, তারা মুসলিম।

ফিলিপাইনের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ এই মিন্দানাও। ফিলিপাইনের অধিকাংশ মুসলিমই এখানে বাস করে। ঐতিহাসিকভাবে এ অঞ্চলকে বলা হয় 'মরোদের ভূখণ্ড'। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মরো শব্দটির উৎপত্তি স্প্যানিশদের মাধ্যমে। এ দেশে পা দেওয়ার পর যখন তারা এখানকার অধিবাসীদের মুসলিম হিসাবে পেল, তখন তাদেরকে মুর বলা শুরু করল, যেমনভাবে উত্তর আফ্রিকার মুসলিমদের (মরক্কোর অধিবাসী) তারা মুর বলত। মিন্দানাও ফিলিপাইনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে বেশ বড় ভূমিকা পালন করে। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, মূল্যবান খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় বর্তমান বা পূর্ববর্তী কোন সরকারই মিন্দানাওয়ের মুসলিম স্বাধীনতাকামী সংগঠন 'মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট' (এমআইএলএফ)-এর সাথে কর্তৃত্বের প্রশ্নে কোন চুক্তিতে সম্মত হয়নি। কেননা প্রেসিডেন্ট ও জনগণ ভাল করেই জানে যে, মিন্দানাও হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার অর্থ লুজন বা ভিসায়াসকেও হারানো।

এদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সুসম্পর্ক বজায় রেখে বসবাস করছে। খৃষ্টানরা আমাদের বিশ্বাস, আমাদের ধর্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। একসময় তারা মুসলমানদের সন্ত্রাসী ও খারাপ লোক হিসাবে দেখত। ফিলিপ্পিনো সেনাদের সাথে মরো মুজাহিদদের যুদ্ধ সম্পর্কে রেডিও-টিভিতে যেসব গুজব নিয়মিত ছড়ানো হয় যে, তারা নিরীহ মানুষ হত্যা করে, তা দিয়ে মুসলমানদের বিচার করত। যদিও এসব মোটেই সত্য নয়। আর যদি হত্যার কাহিনী সত্যও হয় তবে তার কারণ ছিল নিহতরা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কিন্তু যেসব অমুসলিম শিক্ষিত ও মিন্দানাও-এর মুসলিমদের সাথে বসবাস করে আসছে তারা জানে প্রকৃতঅর্থে মুসলমানরা কেমন। তারা আমাদের ভালবাসে, আমাদের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এমনকি অনেকে ধর্মান্তরিতও হয়। তবে আমার খুবই অপছন্দের বিষয় হল নির্বাচন প্রথা। বিশেষত মুসলিম অধ্যুষিত স্থানে নির্বাচন একটি বড় সমস্যা ও ব্যর্থতার কারণ। কেননা এখানে মুসলমানের বিরুদ্ধেই মুসলমানের সংগ্রাম করতে হচ্ছে। যখন নির্বাচন এগিয়ে আসে তখন অনেক পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দলসমূহ পরস্পর বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয় এবং নির্বাচন শেষে শত্রুতে পরিণত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলামানের ভাই'। কিন্তু নির্বাচনে এই ভ্রাতৃত্বের কোন নজীর পাওয়া যায় না। এই তো গতবছরই ম্যাগুইন্দানাও প্রদেশে একজন প্রার্থী অপর প্রার্থীকে সপরিবারে হত্যা করল। একই সাথে সাধারণ মানুষ এমনকি সাংবাদিকদের পর্যন্ত তারা হত্যা করেছিল। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল হত্যাকারী ও নিহত সকলেই মুসলিম। এ কারণে মুসলমানদের নামে খারাপ রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে। আরো লজ্জাজনক যে, সেই প্রার্থী এ ঘটনায় দোষ চাপায় মরো মুজাহিদদের উপর। অথচ সকলেই জানে সে মিথ্যা বলছে। ক্ষণস্থায়ী পদলোভের জন্য তারা একে অন্যকে হত্যা করতে মোটেও দ্বিধা করছে না। সামান্য অর্থের বিনিময়ে মানুষ নিজেদের ভোট বিক্রি করছে। খুব কম লোককেই দেখি যারা আল্লাহ্‌র ভয়ে এসব খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকছে। সবই ঘটছে এই নির্বাচনের কারণে। আমার খুব নিকট আত্মীয়রা এবারের নির্বাচনেও প্রার্থী হয়েছেন। আমি বুঝতে পারছি না আমার কি করা উচিৎ। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনকে কেবল ১০০% নয় বরং সীমাহীন ঘৃণা করি।

এই মিন্দানাওয়েরই পশ্চিম অংশে অবস্থিত আমার জন্মস্থান মারাওয়ী সিটি। এই শহরটি ফিলিপাইনের একমাত্র ইসলামী শহর। আল্লাহ্‌র কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে, আমাদেরকে তিনি এমন একটি হ্রদ দান করেছেন যা ফিলিপাইনের সবচেয়ে স্বচ্ছ জলের হ্রদ। পিতার কাছে শুনেছি, এই শহর একসময় খুব সুন্দর ও পরিস্কার ছিল। মুসলিমরা ছিল খুবই রক্ষণশীল। মহিলারা কেবলমাত্র বাড়িতে ও স্কুলে থাকত। তারা স্কুল থেকে এসে বাড়িতেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করত। বাইরে কোথাও কাজে যেত না। আমাদের নেতারাও ছিলেন শহরবাসীদের উপর খুব দায়িত্বপরায়ণ। কিন্তু আমার মনে হয় সেই সৌন্দর্য, সেই ইসলামিক পরিবেশ আজ হারিয়ে গেছে। আমার মনে পড়ে, স্কুল-কলেজে আমার শিক্ষকরা বলতেন, মারাওয়ী সিটিকে এখন আর ইসলামিক সিটি বলা যায় না। সত্যিকার ইসলামী দেশ হল মালয়েশিয়া, সঊদী আরব। তারা বলতেন, যদি এ সিটি ছেড়ে যাওয়ার

মারাওয়ী লেক

কোন সুযোগ থাকত তবে তারা সেটা হাতছাড়া করতেন না। মিন্দানাওয়ের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা আমার সহপাঠীরা বলত তারা এখানে বড় আশা করে এসেছে। কারণ এটি ফিলিপাইনের একমাত্র ইসলামী শহর। কিন্তু এখানকার অবস্থা দেখে তারা হতাশ হয়ে বলে এটি তো ইসলামী শহর নয়। আমি এজন্য আমার আমাদের শাসকগোষ্ঠীকে দোষারোপ করব। সাধারণ জনগণ ঠিকমতই ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ভূখণ্ড ধর্মীয়-অর্থনৈতিক সবদিক থেকেই অনুন্নতই রয়ে গেছে। আল্লাহই জানেন তারা এসব ট্যাক্সের টাকা কি করছে। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বায়িত্ববান ও তাক্বওয়াশীল শাসক দান করুন এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।

আমার ইউনিভার্সিটির নাম মিন্দানাও স্টেট ইউনিভার্সিটি (এমএসইউ)। মারাওয়ী সিটিতেই এর অবস্থান। পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয় আমার বাড়ি থেকে খুব কাছে অবস্থিত। এখানেই আমার জন্ম ও বেড়ে উঠা। এখানেই আমি কিন্ডারগার্টেন থেকে কলেজ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি এবং এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ আমার খুবই ভাল লাগে। পরিস্কার বাতাস, অনুকূল আবহাওয়া আর চারিদিকে গাছপালায় ঘেরা ছিমছাম ক্যাম্পাস। মিন্দানাওয়ের অধিকাংশ ছাত্রই ফিলিপাইনের অন্যতম সেরা এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হওয়ার স্বপ্ন দেখে। এখানে দেখা মেলে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের অনুসারীদের। মিন্দানাওয়ের বিভিন্ন প্রদেশ ছাড়াও ভিসায়াস ও লুজন থেকেও ছাত্ররা এখানে পড়তে আসে। মুসলিম, খৃষ্টান, নাস্তিক নানা কালচারের স্টুডেন্ট এখানে মিলেমিশে এবং পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই চলে। আমি লক্ষ্য করেছি এখানকার অনেক মুসলিম স্টুডেন্ট যেমন পোশাক-আশাকে খৃষ্টানদের দ্বারা প্রভাবিত, তেমনি অনেক খৃষ্টান স্টুডেন্টও মুসলিমদের দ্বারা প্রভাবিত। তারা ঢিলেঢালা পোষাক, লম্বা পাজামা এমনকি অনেকে বোরকাও পরিধান করে মুসলিমদের প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ। প্রতি রামাযানে আমি দেখেছি তারা আমাদের সামনে পানাহার করতে লজ্জাবোধ করে। আমরা আশে-পাশে না থাকলে তখন তারা আহার সেরে নেয়। এতদসত্ত্বেও যে বিষয়টি পীড়া দেয় তা হল, ইসলামিক সিটির এই বিশ্ববিদ্যালয়েও ইসলামের চর্চা নেই বললেই চলে। রামাযান মাসে এখানে মাত্র ৪ দিনের ছুটি দেয়া হয়। ফলে কুরআন পড়া বা রামাযানের বিশেষ ইবাদত পালনের সুযোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন ক্রিসমাস আসে সুবহানাল্লাহ...দুই থেকে তিন সপ্তাহ টানা ক্লাস হয় না, পুরোটাই ভ্যাকেশন। যেন তারা আমাদেরকে ঈসা (আঃ)-এর জন্মদিবস পালনের জন্য বিশেষ সুযোগ করে দিচ্ছে। এমনিতে ছালাতের সময়ও এখানে ক্লাস চলতে থাকে। ক্লাস টাইমে ছালাতে যাওয়াও নিষেধ। কিন্তু খৃষ্টানদের জন্য প্রার্থনায় কোন বাধা নেই। শুক্রবারে রীতিমত ক্লাস হলেও যথারীতি রবিবারে কোন ক্লাস নেই। আমরা মুসলিম স্টুডেন্টরাও যেন নিজেদেরকে ছালাতবিহীনভাবে থাকায় অভ্যস্ত করে ফেলেছি। কেননা আমাদের তো ক্লাস বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই। অথচ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা প্রায় সকলেই মুসলিম।

এখানকার মুসলিম তরুণ প্রজন্ম যে রোগটিতে বিশেষভাবে ভুগছে তা হল নিজ ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা। তারা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্কে যতটুকু জানে আমাদের রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বা ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে তার ছিটেফোটিও জানে না। তারা কুরআন বা হাদীছের চেয়ে হারাম গান-বাজনার সাথেই বেশি পরিচিত। তারা বিধর্মীদের পোশাক-আশাক অনুকরণে আসক্ত। পশ্চিমা শিক্ষা-দীক্ষা লাভের জন্য তারা বিস্তর সময় ব্যয় করলেও যে জ্ঞানটি অপরিহার্য অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে

মিন্দানাও স্টেট ইউনিভার্সিটি

জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। আমি মিন্দানাও ইউনিভার্সিটির মুসলিম স্টুডেন্টদের অবস্থা এমনটাই দেখি। আমার মনে আছে আমি যখন উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী ছিলাম, দেখতাম আমার খৃষ্টান সহপাঠীরা আরবী বিষয়ে পাশ করতে পারলেও মুসলিমরা পাশ করতে পারত না। কেন? এজন্য পিতামাতারাই মূলত দায়ী। যদি সন্তানরা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে আগ্রহী না হয় তবে তারা কিছু মনে করে না বা তাদেরকে কোন চাপ দেয় না। কোন কোন পিতা-মাতা সন্তানদেরকে পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণে নির্দেশ দেয় যেন তারা কর্মজীবনে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, নার্স প্রভৃতি হতে পারে। যদি কোন শিশু পড়াশোনা না করে অথবা স্কুলে ক্লাসে উত্তীর্ণ না হতে

পারে তাহলে তারা দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে কিন্তু তারা যদি ইসলামী জ্ঞানার্জনে অলসতা দেখায় তাতে তাদের কিছুই যেন যায় আসে না। সকল পিতা-মাতার অবস্থায় যে এমন তা নয়, তবে অনেকেই বা অধিকাংশই এই রোগে আক্রান্ত। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল জনগণ জানে না বা গুরুত্বই দেয় না বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের দুরবস্থার বিষয়ে। আমার এক আন্টি বলতেন, আমাদেরকে আমাদের নিজেদের ব্যাপারেই আগে মনোযোগ দিতে হবে। কেননা আমাদের বর্তমান প্রজন্মের অবস্থাই খুব ধ্বংসাত্মক।

মারাওয়ী মসজিদ

এ সিটির যেদিকেই তাঁকানো যায় দেখা যাবে ফিৎনার বিস্তার। আধুনিক প্রযুক্তি যুবসমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তারা এর মধ্যে এমনভাবে ডুবে থাকছে যে আল্লাহ্র স্মরণে তারা খুব কমই সময় দিচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয় এসব প্রযুক্তির ফিৎনা আর শহরের জীবনের ফিৎনা ছেড়ে দূরে পালিয়ে বাঁচি।

অবশ্য আমি যে মাদরাসায় ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য যাই সেখানকার চিত্র ভিন্ন। এখানে আমি আমার ক্লাসমেটদের সাথে খুব স্বাচ্ছন্দপূর্ণ প্রশান্তিময় সময় উপভোগ করি। অধিকাংশ সময় আমরা এখানে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করি ও আল্লাহ্র প্রশংসায় সময় কাটাই। ক্লাসমেটেরা আল্লাহভীরু এবং তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে। আমি আমার সেসব সহপাঠীদের প্রশংসা করি যারা তাদের পিতা-মাতাকে জোর করে রাজি করিয়ে জেনারেল স্কুল পরিত্যাগ করে মাদরাসায় এসেছে ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য। এমনকি শুধু আরবী ভাষা শিক্ষা, কুরআন মাজীদ হিফয করার জন্য তারা অন্য সবকিছু ছেড়ে দিয়েছে। অনেকেই রয়েছে যারা সঊদী আরব, পাকিস্তান, মিসর, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, আফ্রিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী ইউনিভার্সিটিগুলোতে স্কলারশীপ নিয়ে পড়তে গেছে। আমারও স্বপ্ন রয়েছে কোন একদিন আমিও তাদের মত ইসলামী শিক্ষা অর্জনের জন্য সঊদী আরবে যাব।

আমার সিটিতে বেশকিছু ইসলামী দা'ওয়াহ সংস্থাও রয়েছে যারা সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ এবং ইসলামী সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কার্যক্রম যথাসাধ্য চালিয়ে যাচ্ছে। যেমন 'হায়আতুল আলামিয়া লি তাহফীযিল কুরআনিল কারীম', 'সেন্টার ফর মুসলিম ইউথ উমেন অক্সিলারী সার্ভিসেস (CMYWAS) 'লীগ অফ মুসলিম ইউথ মুভমেন্ট', 'ইউথ পীস এডভোকেট', 'ইনসান ইসলামিক এসেম্বলি', 'আল হুদূদ ইসলামিক একাডেমী', 'রাসায়েলে নূর ইন্সটিটিউট ফিলিপাইন', 'আল উখুওয়া' ইত্যাদি। আল্লাহ তাঁর দ্বীনের এসব মুজাহিদদেরকে সফলতা দান করুন এবং তাদের মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করুন। আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউসে একত্রিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন!!

পাঠকের মতামত

সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট যিনি আমাদেরকে পবিত্র কোরআন ও ছহীহ হাদিছের আলোকে জীবনকে পরিচালনার জন্য একটি সঠিক আক্বীদাপুষ্ট দলের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। পরকথা, আমি যখন মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকায় সর্বপ্রথম "তাওহীদের ডাক" পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখলাম, তখনই আমার মনে সাড়া জাগল এই পত্রিকা আমি কোথায় পাই, কিভাবে পাই? কিছুদিন পর জিজ্ঞাসা করলাম কুমিল্লা জেলার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সভাপতি মাওলানা ছফীউল্লাহর কাছে– 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকাটি কিভাবে পাব? তিনি বললেন, 'আমাদের কুমিল্লা যেলা যুবসংঘের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামের কাছে যাও'। আমি তার নিকট গেলাম, বললাম– 'তাওহীদের ডাক পত্রিকাটি আমি কিভাবে পাব?' তখন তিনি বললেন– 'পত্রিকাটির কতজন গ্রাহক হবে?' তখন আমি বললাম– চার/পাঁচজন হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি বললেন, তাবলীগী ইজতেমা ২০১০-এর সময়ে রাজশাহীতে গিয়ে তাওহীদের ডাক পত্রিকাটির এজেন্ট হয়ে আসব এবং পত্রিকাটি নিয়ে আসব। কিছুদিন পর চলে এল তাবলীগী ইজতেমা ২০১০। সভাপতি ভাই তাবলীগী ইজতেমায় গিয়ে 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকাটি আনলেন। পত্রিকাটি আনার পর আমার আর আনন্দের সীমা নেই। পত্রিকাটি হাতে নিয়ে সর্বপ্রথম তাকালাম প্রথম সংখ্যাটির দিকে তারপর দ্বিতীয় সংখ্যাটির দিকে, তাকিয়ে দেখি কি অপূর্ব প্রচ্ছদ। তারপর দেখলাম আমীরে জামাআতের সাক্ষাৎকার। অতঃপর একটা একটা করে শিরোনাম দেখলাম। এগুলো দেখে কতই না ভাল লাগল। এরপর দেখলাম সূচীপত্র, সূচীপত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কোরআন ও হাদীছের পথনির্দেশিকা। তারপর দেখলাম আক্বীদা, তাবলীগ ইত্যাদি। একটা একটা করে সব পড়ে বুঝলাম 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকাটি যেন জান্নাতের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে এ জাতিকে। পরিশেষে বলি, যারা এ জাতিকে শিরক ও বিদআতমুক্ত একটি সঠিক জাতিতে পরিণত করতে চাচ্ছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্দেশ্য পূরণে সর্বাত্মক ভাবে সহায়তা করুন। আমীন!!

ইলিয়াছ আহমদ
জগৎপুর এ.ডি.এইচ (ডিগ্রি) মাদরাসা,
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তম বন্ধুর পরিচয়

১. যখন সাক্ষাৎ হয় তখন সে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।
২. তার পাশে বসলে ঈমান বৃদ্ধি পায়।
৩. তার সাথে কথা বলে নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।
৪. তার কাজ-কর্ম দেখলে আখিরাতের কথা স্মরণ হয়।

কবিতা

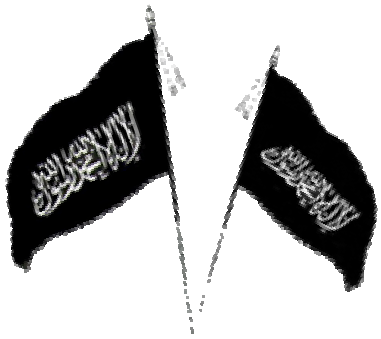

অনল প্রবাহ

সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী

(১)

আর ঘুমিও না নয়ন মেলিয়া
উঠরে মোস্‌লেম উঠরে জাগিয়া
আলস্য জড়তা পায়েতে ঠেলিয়া,
পূত বিভু নাম স্মরণ করি।
যুগল নয়ন করি উন্মীলন,
কর চারিদিকে কর বিলোকন,
অবসর পেয়ে দেখ শত্রুগণ,
করেছে কীদৃশ অনিষ্ট সাধন,
দেখরে চাহিয়া অতীত স্মরি।

(২)

দেখ দেখ চেয়ে নিদ্রার বিঘোরে,
কত উচ্চ হ'তে কত নিম্ন স্তরে,
গিয়াছ পড়িয়া দেখ ভাল ক'রে,
ফিরা'য়ে অতীতে নয়ন দুটি।
অই দেখ চেয়ে অবনী মণ্ডলী,
ল'য়ে নানা জাতি হ'য়ে কুতূহলী,
বিজয় উল্লাসে 'জয়' রব তুলি,
বাধা বিঘ্ন আদি পদযুগে দলি,
তোমাদের তারা পিছনেতে ফেলি,
উন্নতির পথে চলেছে ছুটি।

(৩)

জাগ তবে সবে জাগ এই বেলা,
আলস্যেতে আর কাটিও না বেলা,
এখনো যদি রে কর অবহেলা
পারিবে না তবে জাগিতে আর।
বিলম্ব আর না, জাগ জাগ তবে,
প্রমত্ত হইয়া মাতাইয়া সবে,
উন্নতির পথে 'আল্লা' 'আল্লা' রবে,
ধাও রে সকলে ধাও
একবার।

তূর্যধ্বনি

এ ভীষণ তূর্যধ্বনি প্রাণে প্রাণে হউক ধ্বনিত
বিশ্ববাসী-মোস্‌লেম নিদ্রা ত্যাজি হোক জাগরিত।
শিরায় শিরায় আজি, বিদ্যুদগ্নি উঠুক জ্বলিয়া,
করুক উত্থান সবে, মহা দর্পে পৃথিবী জুড়িয়া।

(১)

হে মোস্‌লেম! কতকাল, মোহঘুমে রহিবে পড়িয়া,
বারেকের তরে কিহে উঠিবে না নয়ন মেলিয়া ?
তোমারে নিদ্রিত দেখি, মহানন্দে তস্করের দল,
লুটিয়া লইল তব উদ্যানের চারু ফুল ফল!
বিশাল সাম্রাজ্য তব পূর্ব হতে পশ্চিম অবধি,
যাভা ও সুমাত্রা হতে, বহে যথা কুইভার নদী !
অনন্ত বিভবময়, সযতনে পালিত ফলিত,
হের দস্যুদল অই, করিতেছে ছিন্ন কবলিত !
সুখ-স্বাস্থ্য বলবীর্য স্বাধীনতা করিছে সংহার,
দিকে দিকে উঠিতেছে, ঘোর মর্মন্তুদ হাহাকার !
ইসলাম জননী আজি সাজি, হায় ! দীনা কাঙ্গালিনী,
চাহিয়া তোদের পানে, অশ্রুধারে ভাষায় মেদিনী !
রে মূঢ় ! তথাপি রহিবি কি ঘুমে অচেতন,
সর্বস্ব হরিয়া, প্রাণে বধিবে কি শেষে দস্যুগণ ?

(২)

অই আটলান্টিক-তীরে স্পেনরাজ্য, রমণীয় দেশ,
যতন সদ্ভূত চারু, স্বরগের উদ্যান বিশেষ।
অতুল ঐশ্বর্যময় মোস্‌লেমের গৌরব-ভাণ্ডার।
শিক্ষার আলোক-দীপ্ত, সভ্যতার উজ্জ্বল আগার !
বিজ্ঞানের লীলাভূমি দর্শন ও সাহিত্যের খনি,
য়ুরোপের শিক্ষা-গুরু, ধরণীর সমুজ্জ্বল মণি !
অগণন কীর্তি হায়, রাজ্য ব্যাপি, রয়েছে পড়িয়া,
বিচরে খ্রীষ্টীয় দস্যু আজি তথা দম্ভেতে পাতিয়া।
অষ্টশত বর্ষ যথা, ছিল হায় ! রাজত্ব তোমার,
তথা হ'তে আজি তুমি নির্বাসিত সাগরের পার !!
প্রতি অণু পরমাণু এখনও করিছে ক্রন্দন,
একটিও কিন্তু হায় ! নাহি তথা মোস্লেম-নন্দন !

পথে প্রান্তরে

*(আমীরে জামা'আত **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** হাজিরার তারিখ হলেই বগুড়া কোর্টের বারান্দায় নিয়মিত দেখা মেলে শীর্ণ শরীরে জীর্ণ আভরণে এই অশীতিপর বৃদ্ধ মানুষটির। কাছে এগিয়ে যেতেই প্রাণজুড়ানো সহাস্য অভিবাদন তাঁর সহজাত। একটি দাঁতও নেই, কিন্তু কণ্ঠে যথেষ্ট তেজ। কৃত্রিম রাগের স্বরে প্রায়ই বলি, 'এই বয়সে এতো কষ্ট করে প্রতিদিনই কেন আসেন? মাঝে মাঝে আসবেন।' 'মনের টানে বাবা'- প্রতিবারই এই জবাব পেয়ে নিরুত্তর হয়ে যাই। গত ৩০.০৯.২০১০ তারিখে জজকোর্টের তিনতলার বারান্দায় তাঁকে নুজ কাঁধ ঝুঁকিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে মনস্থির করে ফেললাম, আজ সময় করে এই বৃদ্ধের সাক্ষাৎকার নেবই। একটু পর কোর্ট বারান্দাতেই তাঁর সাথে আলাপ শুরু হল- আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব)*

আপনার পুরো নাম কি?

জসীমুদ্দীন মণ্ডল।

বয়স কত?

৮৬

বাড়ী কোথায়?

রামেশ্বরপুর, মাছপাড়া, গাবতলী। এখানে বাসে আসতে ১ ঘণ্টা লাগে। সিএনজিতে আধাঘণ্টা।

আহলেহাদীছ কবে হয়েছিলেন মনে আছে?

বাপ-দাদা থেকেই আমরা আহলেহাদীছ। বাপ-দাদারা ঐ সময়ই আমাদের গ্রামে মসজিদ তৈরী করেছিলেন। তখন মানুষ আমাদের মুহাম্মাদী বলত।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সন্ধান পান কখন?

৮৫-তে আলতাফুন্নেছা খেলার ময়দানে যখন সম্মেলন হল তখনই এ সংগঠনের সাথে আমার পরিচয়। এর আগে সংগঠন সেভাবে বুঝতাম না। তবে আমরা মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফজলের খুব ভক্ত ছিলাম।

৮৫-এর ঐ সম্মেলনের কোন স্মৃতি আপনার মনে পড়ে?

হ্যা, খুব মনে পড়ে। হানাফী সমাজের লোকেরা সভা পণ্ডের চেষ্টা করেছিল। সন্ধ্যার দিকে আলতাফুন্নেছার ঐ শেষ গেটটা (আদালতের ৩ তলা থেকে পার্শ্বেই অবস্থিত মাঠের দিকে ইশারা করে) দিয়ে তাদের একদল লোক প্যাণ্ডেলের পিছন থেকে ভাঙ্গা শুরু করল। ওদের কথা ছিল 'এ্যাদের সভা করবার দেয়া যাবি না। এ্যারা হামাদের গীবত গাবি।' তখন সম্ভবত ডিসির কাছে ফোন করা হল। কিছুক্ষণ পর পুলিশ এসে সব ঠিক করে দিল। রাত ৮/৯টার দিকে সভা শুরু হল। ড. বারী সাহেব কিছুক্ষণ বক্তৃতা করার পর গালিব সাহেব বক্তৃতা করলেন। উনার স্বাস্থ্য তখন একেবারে হালকা পাতলা। তাঁর বক্তব্য এমনই হল যে হানাফীরা সব স্তব্ধ হয়ে গেল। তাদের কথা ছিল, ইনি কি বলল আর আমাদের বক্তারা কি বলে। আমরা তো তাহলে ভুল পথে আছি! আমি উনাকে তখনও চিনতাম না। কিন্তু ভাষণ শুনে সেদিনই বুঝেছিলাম, ইনি একদিন একটা কিছু হবেন।

আপনি রাজশাহীর তাবলীগী ইজতেমায় প্রথম কখন গিয়েছিলেন?

৯১-এর সম্মেলন থেকে আমি নিয়মিত রাজশাহী যাই। এ পর্যন্ত সব কটা ইজতেমায় গিয়েছি। তখন খাওয়ার সময় সংগঠনের নাম লেখা থালা দেয়া হত। ১০/১২ টাকা ডেলিগেট ফি ছিল। সেই থেকে সংগঠনের কোন সম্মেলন আমি বাদ দেই না। এ পর্যন্ত সব বড় সম্মেলনেই আমি উপস্থিত থেকেছি।

লেখাপড়া জানেন আপনি?

ছোটবেলায় বাপ-মারা যাওয়ায় ক্লাস ওয়ানের বেশি পড়তে পারিনি। তবে লিখতে পড়তে পারি।

ছেলে-মেয়ে আছে?

৬২ সালে প্রথম বিয়ে করি। ৬৭ সালে আরেকটি। পরে দু'স্ত্রীই মারা গেলে ৮৮ সালে আরেকটি বিয়ে করি। সেও মারা গেছে। মেয়ে রয়েছে একটা। আর কোন সন্তান হয়নি। এই বুড়ো বয়সে জামাইসহ মেয়ে আমার কাছেই থাকে। নাতী-নাতনী নিয়ে একরকম কাটছে ভালই। তবে দুঃখ যে ওরা লেখাপড়া না শিখে কাজে নেমে পড়ছে।

কি করেন বাড়িতে?

আগে মক্তব চালাতাম। এখন মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত আযান দেই। মাঝে মাঝে ইমাম না থাকলে ছালাতও পড়াই। এভাবেই কাটছে বুড়ো বয়সটা।

প্রতি তারিখেই এত কষ্ট করে আপনি আদালতে হাজির হন কেন?

(ছলছল চোখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে) মনের টানে, চোখের দেখা দেখতে। দেহের সামর্থ্য যতদিন আছে আমি আসবই। প্রতিবার মনে হয় যে, পরের বার যদি আর আসতে না পারি। সেই ২০০৫ সালে প্রথম বগুড়া আদালতে আনার পর বহু পুলিশের মধ্য দিয়ে আমীর সাহেবের সাথে জোর করে মুছাফাহা করেছিলাম। সেই থেকে একটা তারিখও বাদ দেইনি। প্রতিদিন এসেছি দেখতে। না আসলে শান্তি পাই না।

আপনার সময়ের তুলনায় বর্তমান সময়ে আহলেহাদীছদের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন মনে হয়?

অনেক অনেক ভাল। আগে মানুষ আমাদের দেখলে বলত, এরা শুধু এলোমেলো করে। সমাজে ফিৎনা-ফ্যাসাদ বাধায়। এখন মানুষ আমাদের বই পড়ে আর বলে, এরাই ঠিক। এরাই ছহীহ কথা বলছে। আমরাই এতদিন ভুল পথে ছিলাম না জেনে।

এর কারণ কি মনে হয়?

বই। বই-পত্রিকা থাকার কারণেই মানুষ সঠিক জিনিস জানছে আর আমল করছে। নিজেদের ভুল বুঝছে।

নাতি-নাতনীদের কি উপদেশ দেন?

বলি তোরা বই পড়। সত্য জানার চেষ্টা কর। ওদের

নিজের ব্যাপার কোন আফসোস আছে?

না কোন দুঃখ, আফসোস আমার নেই। আল্লাহ আমাকে কখনো কষ্টে ফেলেননি। আমি খুব সুখে আছি, ভাল আছি।

Contents

সংগঠন সংবাদ

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১০

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব নির্ধারিত ২০১০ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ছাত্র ও তরুণসমাজকে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে ছিরাতে মুস্তাকিমের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। তাদের কুরবানীর মাধ্যমেই ইসলামের বিশুদ্ধ বার্তা এ দেশের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। এভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হবে। তিনি আরো বলেন, যুগে যুগে ত্বাগুতী শক্তি তাওহীদী আন্দোলনকে স্থবির করার জন্য নানাভাবে প্রয়াস চালিয়ে গেছে। বর্তমানেও আহলেহাদীছ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য সেক্যুলার ও পপুলার ইসলামী নামধারী শক্তি একত্রিত হয়ে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভবী। মিথ্যার আঘাত যত বড়ই হোক না কেন সত্যের বিজয়কে তা কখনই রুখতে পারে না। শুধু প্রয়োজন সত্যকে প্রচার করা এবং সত্যকে উচ্চকিত করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া।

'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফিকুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দারুল ইফতা সদস্য ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার প্রমুখ।

সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফ্ফর বিন মহসিন, 'আন্দোলন'-এর কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা ছফীউল্লাহ, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘ' ঢাকা যেলার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছফিউল্লাহ খান, নরসিংদী যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামূন, কুমিল্লা যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি অধ্যাপক শাহিদুজ্জামান ফারুক, সাবেক সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি হাফেয মুকাররম বিন মহসিন প্রমুখ। অতিথি বক্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আব্দুল্লাহ যামান।

সম্মেলনে মোট ১১টি প্রস্তাবনা পাঠ করা হয়। দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে বাস, ট্রেন ও মাইক্রোবাস যোগে আগত কর্মীদের দ্বারা মিলনায়তন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। পরিশেষে সফলভাবে সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ায় মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানিয়ে এবং উপস্থিত নেতা-কর্মীদের মোবারকবাদ জানিয়ে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

কেন্দ্রীয় কর্মী প্রশিক্ষণ ২০১০

রাজশাহী ২৩, ২৪, ২৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ঢাকা, কুমিল্লা, নরসিংদী, গাজীপুর, সাতক্ষীরা, যশোর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ ও রাজশাহী যেলা অংশগ্রহণ করে। তিনদিনব্যাপী এই কর্মী প্রশিক্ষণে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক ফারুক আহমাদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব প্রমুখ। তিন দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি 'যুবসংঘে'র বিগত দিনের ইতিহাসের উপরে কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এতে বহু অজানা তথ্য জানতে পেরে কর্মীগণ দারুণভাবে উজ্জীবিত হন। দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, অহি-র দাওয়াত দিতে গেলে বিভিন্ন বাধা আসবে। সেসকল বাধাকে ঈমানী শক্তি নিয়ে পেরিয়ে যেতে হবে। কোন যুলুম-নির্যাতনের ভয়ে হক-এর দাওয়াত হ'তে পিছিয়ে থাকা যাবে না। তিনি কর্মীদেরকে যে কোন মূল্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালিত এ মহান সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম (রাজবাড়ী) ১ম স্থান, মুহাম্মাদ যুবায়েদ আলী (কুমিল্লা) ২য় স্থান ও মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (ঢাকা) ৩য় স্থান অধিকার করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ও দো'আ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও সাবেক সভাপতি ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ।

প্রশিক্ষণ

কেশবপুর, যশোর ৬-৭ জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ৬ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বাদ আছর যেলার মজীদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ শুরু হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুত্তালিব বিন ঈমান, বাগেরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক প্রমুখ। প্রথম দিন বাদ আছর শুরু হয়ে পরের দিন আছর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলে।

দেশব্যাপী কর্মী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

২১ জানুয়ারী ২০১১: 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে দেশব্যাপী কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন যেলা থেকে মানোন্নয়ন প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

কমিটি গঠন

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব ২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের ছাত্র হাফেয আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, মীযানুর রহমান, আব্দুল গণী প্রমুখ। আলোচনা সভায় হাফেয আব্দুল মতীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট বেন আলীর পতন

সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে এখন এক উত্তাল পরিবেশ। গত ১৭ই ডিসেম্বর ২০১০ পুলিশী নির্যাতনের শিকার মোহাম্মাদ বোয়াজিজি নামক এক সবজী ফেরীওয়ালার আত্মাহুতি তিউনীসীয় জনগণকে এতটাই ক্ষুব্ধ করে তোলে যে, সে ক্ষোভের আগুনে ছারখার হয়ে দীর্ঘ ২৩ বছরের প্রতাপশালী শাসক যায়নুল আবেদীন বেন আলী ক্ষমতা হারান এবং দেশ ছেড়ে পালিয়ে প্রাণে রক্ষা পান। উল্লেখ্য, দেশটিতে দীর্ঘদিন যাবৎ চলমান বেকারত্ব ও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সাধারণ জনগণের মাঝে ব্যাপক হতাশার জন্ম দিয়েছিল। এ অবস্থা পরিবর্তনের তরুণ ছাত্রসমাজ বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকেই নিয়মিত আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। সরকার তা কঠোর হস্তে মোকাবিলা করায় ছাত্রসমাজ আরো বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। পরিশেষে বুয়াজিজির ঘটনা জনমনে রোষের দাবানল জ্বালিয়ে দেয়। সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে সারাদেশ। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার কঠোর দমননীতি অবলম্বন করেও কোনভাবেই সে বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ করা যায় নি। এমতাবস্থায় প্রেসিডেন্টের আত্মীয়-স্বজন বিপদ বুঝে গোপনে দেশত্যাগ করতে শুরু করে। চূড়ান্ত পর্যায়ে সামরিক বাহিনীও প্রেসিডেন্টের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে চরম বেকায়দায় পড়েন বেন আলী। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি গত ১৪ই জানুয়ারী মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেন এবং দেশে জরুরী অবস্থা জারী করেন। একই দিনে তিনি গোপনে তড়িঘড়ি করে দেশত্যাগ করে প্রথমে ফ্রান্সে অবতরণের চেষ্টা করেন। কিন্তু অনুমতি না পাওয়ায় সঊদী আরবের জেদ্দা নগরীতে অবতরণ করে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। বর্তমানে সে দেশে অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মাদ ঘানৌচি। আগামী ৬ মাসের মধ্যে সেখানে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যাক্ত করেছেন। যদিও ইতোমধ্যে তার বিরুদ্ধেও সেখানে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।

মিসরের তীব্র গণবিপ্লবের মুখে নতি স্বীকারে বাধ্য হলেন লৌহশাসক হোসনী মোবারক

তিউনিসিয়ার গণবিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশ মিসরেও গত জানুয়ারী মাসের ২৫ তারিখ ঘোষণা করা হয় Day of angar বা 'ক্রোধের দিবস'। বিশেষত যুব সংগঠনগুলোই ছিল এ আন্দোলনের প্রধান উদ্গাতা। ফেসবুক, টুইটার প্রভৃতি মাধ্যম ব্যবহার করে অতি স্ত সময়ে তারা আন্দালনকে সুসংগঠিত করে ফেলে। প্রথমে অনেকটা অপ্রস্তুতভাবে আন্দোলন শুরু হলেও শীঘ্রই তা অবিশ্বাস্যরকম এক শক্তিশালী গণবিপ্লবে রূপ নেয়। কায়রো শহরের লিবারেশন স্কয়ার পরণিত হয় সরকার বিরোধী আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে। হতকচিত মোবারক সরকার রাতারাতি কার্ফূ জারি করে আন্দোলনকারীদেরকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশের সাথে তীব্র সংঘর্ষে হতাহত হয় উভয় পক্ষই। ২৮শে জানুয়ারী 'ক্রোধের জুম'আ' দিবস ঘোষণা করে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। মুসলিম ব্রাদারহুড এই দিনের উদ্দ্যোগকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং নোবেল বিজয়ী পরমাণুবিজ্ঞানী মোহাম্মাদ আল-বারাদেই আন্দোলনকে সমর্থন দেওয়ার জন্য স্বশরীরে উপস্থিতির ঘোষণা দেন। জুম'আর ছালাতের পরপরই লক্ষাধিক মানুষের মিছিলে তাহরীর স্কয়ার উত্তাল হয়ে পড়ে। জ্বালিয়ে দেয়া হয় মোবারকের এনডিপি পার্টির সদর দফতর। বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হয় জনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষ। প্রতিদিনই হতাহত হয় শত শত লোক। দেশের ফোন, ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। ব্যাপক ধরপাকড় করা হয় ব্রাদারহুডসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের। ভেঙ্গে পড়ে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা। পুলিশের গুলিতে কয়েকদিনে হতাহত হয় সহস্রাধিক জনতা। ১লা ফেব্রুয়ারী শুধু কায়রোর তাহরীর স্কয়ারেই জড়ো হয় প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ। সারাদেশেও একইভাবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। এইদিন রাত ১১টায় হোসনী মোবারক জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি পুলিশের বাড়াবাড়িতে বহু লোকের প্রাণহানী হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং প্রতিবাদীদের দাবী মেনে রাজনৈতিক সংস্কারের অঙ্গীকার করেন। আর জানিয়ে দেন যে, আগামী সেপ্টেম্বরে জাতীয় নির্বাচন হবে এবং তিনি সে নির্বাচনে আর প্রার্থী হবেন না। বিদ্রোহীরা স্বাভাবিকভাবেই এ আশ্বাস মেনে নেয়নি। পরদিন ২রা ফেব্রুয়ারী হঠাৎ করে মোবারক সমর্থক নামধারী এনডিপি পার্টির ভাড়াকৃত কয়েক হাজার লোক পুলিশী সহযোগিতায় তাহরীর স্কয়ারে অবস্থানরত বিদ্রোহীদের উপর ঘোড়া ও উটে আরোহন করে পাল্টা হামলা চালায়। এতে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়ে উঠে। হতাহত হয় উভয় পক্ষের লোকজন। অতঃপর ৪ঠা ফ্রেব্রুয়ারী ঘোষণা করা হয় 'বিদায়ী জুম'আ' দিবস। এদিনও তাহরীর স্কয়ারে ২০ লক্ষাধিক মানুষ জুম'আর ছালাত আদায় করে। দিনরাত সর্বক্ষণ তারা সেখানে অবস্থান করতে থাকে। পরবর্তী সপ্তাহেও প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। প্রতিটি দিন অর্থবহ করে তোলার জন্য বিপ্লবীরা দিনগুলোকে নানা নামে আখ্যায়িত করে। অবশেষে ১০ই ফেব্রুয়ারী ক্ষমতা ধরে রাখতে অনড় প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক পদত্যাগ করতে পারেন বলে আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তাহরীর স্কয়ারে অবস্থানরত উৎফুল্ল ৩০ লক্ষ জনতা টেলিভিশনে দেয়া হোসনী মোবারকের ভাষণে হতচকিয়ে যায়, যখন তিনি পুনরায় ক্ষমতায় থাকার জোরালো ঘোষণা দেন। বিক্ষুব্ধ জনতা পরদিন পুনরায় বিরাট বিক্ষোভের প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলে অবশেষে ১১ই ফেব্রুয়ারী ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলাইমান ঘোষণা দেন যে, প্রেসিডেন্ট পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করেছেন এবং সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পর্ষদ ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। ১২ই ফেব্রুয়ারী কার্ফূ প্রত্যাহার করে নেয়া হয় এবং সেনাবাহিনী ঘোষণা করে যে, তারা ইসরাঈলের সাথে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি শ্রদ্ধার সাথেই পালন করবে। এভাবে তিন শতাধিক লোকের রক্তস্নাত মাত্র আঠারো দিনের আন্দোলনে মিসরের ৩০ বছরের শাসক লৌহমানব খ্যাত হোসনী মোবারকের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

বিভক্ত হয়ে গেল আফ্রিকার বৃহত্তম মুসলিম দেশ সুদান

সুদানের দারফুর অঞ্চলে দীর্ঘ ২৭ বছর যাবৎ গৃহযুদ্ধ চলার পর ৮ মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত দক্ষিণ সুদানে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় গত ৯ই জানুয়ারী থেকে ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত। খৃষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রচুর খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ সুদানের দক্ষিণাঞ্চলকে স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠাদানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপে এই গণভোটের আয়োজন করে সুদান সরকার। অতঃপর গত ৭ই ফেব্রুয়ারী গণভোটের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। যেখানে দেখা যায় ৯৮.৮৩% ভোটার দেশ বিভক্তির পক্ষে রায় দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশীর এই ফলাফল মেনে নিয়েছেন। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরীর জন্য আগামী ৯ই জুলাই পর্যন্ত দেশটির চূড়ান্ত স্বাধীনতা ঘোষণার সম্ভাব্য তারিখ পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। দেশটির সম্ভাব্য নাম হবে 'রিপাবলিক অফ সাউথ সুদান'। এর মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে স্বাধীনতালাভের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশটি উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত হয়ে গেল।

নওমুসলিম বৃটিশের সংখ্যা ১ লক্ষ ছাড়িয়েছে

বৃটেনের 'ফেইথ ম্যাটার' একটি সংস্থা পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বৃটেনে নওমুসলিম বৃটিশের সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশী। গত বারো মাসেই সেখানে ইসলাম গ্রহণ করেছে ৫২০০ জন বৃটিশ। যাদের মধ্যে ১৪০০ জন রাজধানী লন্ডনের অধিবাসী। এদের দুই-তৃতীয়াংশই আবার মহিলা যাদের মধ্যে ৭০% শ্বেতাঙ্গ এবং তাদের গড় বয়স ২৭ বছর। নারীদের প্রতি ১০ জনে ৯ জনই বলেছেন, ইসলাম গ্রহণ করে তারা বোরকা ও স্কার্ফের মত রক্ষণশীল পোষাক পরিধান করা শুরু করেছেন। অর্ধেকের বেশীই বলেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের কারণে তারা পরিবার ও সমাজ থেকে নেতিবাচক আচরণের সম্মুখীন হয়েছেন।

Contents

সাম্প্রতিক বাংলাদেশ

১. আয়তনে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম পৌরসভা কোনটি?
উত্তর : ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর।
২. বাংলাদেশের কোন জেলায় শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেশী?
উত্তর : নাটোর (সর্বনিম্ন পাবনা ও জয়পুরহাটে)।
৩. ১৫ ডিসেম্বর ২০১০ কোন স্থানকে দেশের ৩১২তম পৌরসভা ঘোষণা করা হয়?
উত্তর : কুয়াকাটা, পটুয়াখালী।
৪. বাংলাদেশের তৈরী পোশাক আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্বিতীয় জাপান)।
৫. ২০১১ সালের জানুয়ারীতে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো কোন পণ্যটি আমদানি করে?
উত্তর : ফার্নেস অয়েল।
৬. বিশ্বের সবচেয়ে কার্যকর সোলার এনার্জি সেল উদ্ভাবক কে?
উত্তর : ড. জামালউদ্দিন (বাংলাদেশ)।
৭. ৮ জানুয়ারি ২০১১ প্রধানমন্ত্রী কোনটিকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নতি করার ঘোষনা দেন?
উত্তর : রংপুর।
৮. বাংলাদেশ রাইফেলস (BDR)-এর পরিবর্তিত নাম কি?
উত্তর : "বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ"(BGB)
৯. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কবে অনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে?
উত্তর : ২৩ জানুয়ারী, ২০১১।
১০. কৃষি বিষয়ক বেতার কেন্দ্র চালু হচ্ছে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে?
উত্তর : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে।
১১. সোমালিয়ার জলদস্যুরা বাংলাদেশের যে জাহাজটি ছিনতাই করে তার নাম কি?
উত্তর : এমভি জাহান মনি।
১২. দেশের বৃহত্তম সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত কোথায়?
উত্তর : সন্দ্বীপ, চট্রগ্রাম।
১৩. সম্প্রতি কোন গাছকে জতীয় বৃক্ষ (গাছ) ঘোষণা করা হয়?
উত্তর : আম।
১৪. জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে শান্তিরক্ষী প্রেরণে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : বাংলাদেশ।
১৫. দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃত্রিম লেক কোনটি?
উত্তর : মহামায়া লেক (মিরসরাই, চট্রগ্রাম) বৃহত্তম লেক হল কাপ্তাই লেক।
১৬. সম্প্রতি দেশে চালুকৃত নতুন টেলিভিশন চ্যানেলের নাম কি?
উত্তর : সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন।
১৭. বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমী কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ভাটিয়ারি, চট্রগ্রাম।
১৮. বাংলাদেশ নেভাল একাডেমী কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : পতেঙ্গা, চট্রগ্রাম।
১৯. বাংলাদেশ এয়ারফোর্স একাডেমী কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : যশোর।
২০. সম্প্রতি দেশে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাসের নাম কি?
উত্তর : নিপা।
২১. বাংলাদেশে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী সংগঠনের নাম কি?
উত্তর : ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ।

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক

১. বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতুর নাম কি?
উত্তর : কিংদাও হাইওয়ান সেতু, চীন (৪২.৫৮ কি.মি)।
২. বিশ্বের সর্বপ্রথম কাঠের কুরআন শরীফ তৈরী করেন কে।
উত্তর : শিল্পী মহসেন ফুলাদি (ইরান)।
৩. ২০১১ সালের জানুয়ারীতে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে কার কণ্ঠে স্বরযন্ত্র স্থাপন করা হয়?
উত্তর : ব্রেন্ডা জেনসন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)(১ম- টিমোথি হিয়েডলার)।
৪. ইউরেনিয়াম উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : কাজাখস্তান (২য়-কানাডা)
৫. বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির ট্রেনের নাম কি?
উত্তর : হারমনি এক্সপ্রেস (চীন)।
৬. বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার কম্পিউটার কোনটি?
উত্তর : তিহান-১।
৭. বিশ্বের বৃহত্তম নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কি?
উত্তর : রিয়াদ উইমেন্স বিশ্ববিদ্যালয়।
৮. সামাজিক যোগাযোগ সাইট "টুইটার" এর প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : বিজ স্টোন।
৯. "উইকিলিকস" এর প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ (অস্ট্রেলিয়া)
১০. বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম কিডনি আবিস্কারক কে?
উত্তর : ড. শুভ রায় (বাংলাদেশ)।
১১. বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন "দ্য প্রিন্সেস টাওয়ার " কোথায় নির্মিত হচ্ছে?
উত্তর : দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাত)।
১২. ১ জানুয়ারি ২০১১ কোন দেশ ইউরো মুদ্রা চালু করে?
উত্তর : এস্তোনিয়া।
১৩. বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত কতটি দেশে ইউরো মুদ্রা চালু রয়েছে?
উত্তর : ১৭টি
১৪. জনসংখ্যায় আফ্রিকার বৃহত্তম শহর কোনটি?
উত্তর : কায়রো, মিশর।
১৫. ২০১০সালে বিশ্বের শীর্ষ মোটর গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নাম কি?
উত্তর : টয়োটা (জাপান)।
১৬.১ মার্চ ২০১১ সার্কের দশম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কে?
উত্তর : ফাতিমা দিয়ানা সাঈদ (মালদ্বীপ)।
১৭. বিমসটেকের স্থায়ী সচিবালায় বা সদর দপ্তর কোথায় হচ্ছে?
উত্তর : ঢাকা, বাংলাদেশ।
১৮. ২০১১ সালে কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে বিশেষ অবদানের জন্য বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর : আবদুল্লাহ আহমাদ বাদাবী (মালয়েশিয়া)।
১৯. ইসরাইলের চালকবিহীন জঙ্গি বিমানের নাম কি?
উত্তর : 'ইটান', যার অর্থ 'শক্তিশালী'।
২০. বিশ্বের দীর্ঘতম রেলওয়ে টানেলের নাম কি?
উত্তর : গোথার্ড বেস টানেল (সুইজারল্যান্ড এবং ইতালি)।
২১. সম্প্রতি কোন দেশে জনসমক্ষে ধূমপান নিষিদ্ধ আইন কার্যকর হয়?
উত্তর : স্পেনে।

আইকিউ

কুইজ-১ ও কুইজ-২ এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ৩০ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। -বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ-১ :

১. পবিত্র কুরআনের বর্তমান নুসখাটি কে লিপিবদ্ধ করেন?

ক. হাস্সান বিন ছাবিত (রাঃ), আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ), আবুবকর (রাঃ), ওসমান (রাঃ)।

২. শহীদের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে ১টি ব্যতীত, সেটি কোনটি?

ক. ঋণ, খ. যেনা, গ. গীবত, ঘ. হত্যা।

৩. طسم দ্বারা শুরু হয়েছে কুরআনের কয়টি সূরা?

ক. ১টি, খ. ২টি, গ. ৩টি, ঘ. ৪টি।

৪. পবিত্র কুরআনে নাছারাদেরকে কি বলা হয়েছে?

ক. পথভ্রষ্ট, খ. যালিম, গ. মুনাফিক, মিথ্যাচারী।

৫. সর্বাধিক প্রসিদ্ধ আরবী ব্যাকরণবিদের নাম কি?

ক. নাহহ্াস, খ. সিবাওয়াইহ, গ. কেসাঈ, ঘ. খলীল বিন আহমাদ।

৬. তাবেঈনদের যুগ শেষ হবার পর সর্বপ্রথম কুরআনের তাফসীর করেন কে?

ক. ইমাম ইবনু কাছীর, খ. ইমাম তাবারী, গ. ইমাম শাফেঈ, ঘ. ইমাম আহমাদ।

৭. ঈদে মিলাদুন্নবী সর্বপ্রথম কারা চালু করে?

ক. ফাতেমীয়রা, খ. শী'আরা, গ. মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরী, ঘ. মনসুর হাল্লাজ।

৮. কোন পানি যা আকাশ থেকেও পতিত হয় না, মাটির নীচ থেকেও বের হয় না?

৯. এশিয়ার সবচেয়ে বড় শহর কোনটি?

১০. কঙ্গোর পূর্ব নাম কি ছিল?

কুইজ-২ :

১. তাওহীদের বিপরীত কি?

ক. বিদ'আত। খ. ফিসক। গ. নিফাক। ঘ. শিরক।

২. মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ কোন অঞ্চল বিজয়ের জন্য বিখ্যাত ?

ক. মিসর। খ. জেরুজালেম। গ. শাম। ঘ. কন্সট্যান্টিনোপল।

৩. মিসরে সম্প্রতি বিদ্রোহ শুরু হয় কবে?

ক. ১৭ ডিসেঃ। খ. ৪ জানুঃ। গ. ১৪ জানুঃ। ঘ. ২৫ জানুঃ।

৪. আহলেহাদীছ আন্দোলনের সংকট ও সংস্কার যুগ কখন?

ক. ৩৭ হিঃ। খ. ৮০ হিঃ। গ. ১০০-১৩২ হিঃ। ঘ. ১৫০ হিঃ।

৫. বালাকোট যুদ্ধ সংঘটিত হয় কোন সালে?

ক. ১৮৩১ খৃঃ। খ. ১৮৫৭ খৃঃ। গ. ১৯৪৭ খৃঃ। ঘ. ১৯০৬ খৃঃ।

৬. মিসর বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি কে ছিলেন?

ক. আমর বিনুল আস। খ. খালিদ বিন ওয়ালিদ। গ. কুতায়বা বিন মুসলিম। ঘ. তারিক বিন যিয়াদ।

৭. আবু আমিনা বিলাল ফিলিপস কত সালে ইসলাম গ্রহণ করেন?

ক. ১৯৪৭ খৃঃ। খ. ১৯৭১ খৃঃ। গ. ১৯৭২ খৃঃ। ঘ. ১৯৭৫ খৃঃ।

৮. সুদান বিভক্তির জন্য গণভোটের রায় কবে প্রকাশিত হয়?

ক. ৯ জানুঃ। খ. ১৫ জানুঃ। গ. ১ ফেব্রুঃ। ঘ. ৭ ফেব্রু।

৯. গত বারো মাসে বৃটেনে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা কত?

ক. ৫০০০ জন। খ. ৫২০০ জন। গ. ৪৮০০ জন। ঘ. ৪০০০ জন।

১০. দেশের সর্বশেষ পৌরসভার নাম কি?

ক. কুয়াকাটা। খ. থানচি। গ. রৌমারী। ঘ. সেন্টমার্টিন।

(উত্তরের জন্য বর্তমান সংখ্যাটি দেখুন)

গত সংখ্যার কুইজ (১) -এর সঠিক উত্তর

১. আবুবকর (রাঃ), ২. মসজিদে ক্বোবা, ৩. যুবায়ের বিনুল আওয়াম, ৪. যুলকারনাইন। ৫. مدهامتان (সূরা আর রহমান, আয়াত-৬৪, সূরা আরম্ভমূলক আয়াত বাদ দিয়ে সবচেয়ে ছোট) ৬. লবন, ৭. রূহ বা আত্মা ৮. লণ্ডন, ৯. কায়রো, ১০. কলিকাতা ।

গত সংখ্যার কুইজ (২) -এর সঠিক উত্তর

১. ক, ২. ক, ৩. ক, ৪. খ, ৫. ক, ৬. খ, ৭. গ, ৮. ক, ৯. ক, ১০, খ।

গত সংখ্যার কুইজের ফলাফলঃ

[গত সংখ্যার কুইজেও অংশগ্রহণকারীদের কেউ পূর্ণ সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। এজন্য কাউকে বিজয়ী ঘোষণা করা গেল না। আগামীতে আপনাদের আরো অংশগ্রহণ আশা করছি।- বিভাগীয় সম্পাদক]

শব্দজোট :

{শব্দজোটটি পূরণ করে নাম-ঠিকানাসহ ১৫ এপ্রিলের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সঠিক উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। এবারের শব্দজটটি তৈরী করেছেন রাকিবুল ইসলাম, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,রাবি}

১			■	■	২		৩
	■	■	■	■	■	■	
	■	৪			৫	■	
■	■		■	■		৮	■
■	■		■	■		■	■
৬	■	৭				■	৮
	■	■	■	■	■	■	
৯			■	■	১০		

পাশাপাশি

১. একজন প্রসিদ্ধ নবী ২. জাহান্নামের একটি নাম ৪. কুরআনের একটি সূরা ৭. চীনের একটি বিতর্কিত প্রদেশ ৯. সম্মান ১০. উচ্চ বংশীয়।

উপর-নীচ

১. কিয়ামতের পূর্বে আবির্ভূত হবে এমন কিছু ৩. আরবী মাসের নাম ৪. জামা'আতে ছালাত আদায়ের অপরিহার্য অংশ ৫. রিসালাতের প্রতিশব্দ ৬. লিখনযন্ত্রের আরবী প্রতিশব্দ ৮. আকাশের প্রান্ত।

গত সংখ্যার শব্দজোট বিজয়ী ৩ জন

প্রথমঃ মুহাম্মাদ ফেরদাউস
বড় বনগ্রাম (ভাঁড়ালীপাড়া), সপুরা, রাজশাহী

দ্বিতীয়ঃ মুহাম্মাদ ইনামুল্লাহ আল মুজাহিদ
মাহমুদপুর, আলীপুর, সাতক্ষীরা।

তৃতীয়ঃ কায়েসউদ্দীন
বান্ধাইখাড়া ডিগ্রী কলেজ, আত্রাই, নওগাঁ।

গত সংখ্যার শব্দজট-এর সঠিক উত্তর

পাশাপাশি : ১. সালাম ৩. আলিম ৬. কলা ৯. ফল ১৪. কবর ১৫. বাবর।

উপর-নীচ :

১. সাগর ২. মক্তব ৩. আমল ৪. মদীনা ৫. হজ্ব ৬. কফ ৭. লাল ৮. চাঁদ ১০. অস্থির ১১. জানাজা ১২. সাহারা ১৩. আতর।

Contents

আমর বিন মায়মূন আওদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে নছীহতস্বরূপ বললেন, পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে বিরাট সম্পদ মনে করো।

(১) বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে।
(২) রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে।
(৩) দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে।
(৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে।
(৫) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।

(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭৪, সনদ ছহীহ)।

মুস্তাওরিদ বিন শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহর কসম! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হল, যেমন- তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি আঙ্গুল ডুবিয়ে দেয়, অতঃপর সে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে আসল'।

(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৬)।